নিশিপদ্ম

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীউষারাণী বসু

শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু—

সূচী

নিশিপদ্ম

পরিচয় : একটি চরিত্রহীন নারীর কল্পকামনা ও মিথ্যাভাষণ নিয়ে এই গল্প।

কাশীধামে বিশ্বনাথের সঙ্কীর্ণ গলির পথে তু'জনে দেখা! বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যে তু'জনে তু'জনকে চিন্‌তে পারল। কিন্তু এ চেনার মধ্যে ছিল অনেকখানি বিস্মৃতি ও অনেকটা ব্যবধান। সে ব্যবধান বহুদিনের।

স্বামী আর স্ত্রী, শৈলেশ আর উমা। পথ দিয়ে তারা চলেছিল। চলেছিল মন্দির-দর্শনে। অনেক দেশ ঘুরে তারা কাশীতে এসে পৌঁছেছে।

মন্দিরে তখন রাত্রের দ্বিতীয় আরতির ঘণ্টা দিতে আর দেরী নেই। চোখে-চোখে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে উমা গিয়ে খপ্‌ ক'রে তার একখানি হাত ধরে' বলে' উঠলো, পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী থম্‌কে দাঁড়িয়ে একটা ঢোক গিলে বল্‌লে, চিন্‌তে পেরেছি। ভাল ত? এ দেশে যে?

আনন্দের আবেগে উমা বলে' উঠলো, পার্ব্বতী, কোথা ছিলি ভাই এতদিন?

একটা দোকানের উগ্র আলো এসে উমার মুখের উপর পড়েছিল। তার মাথায় সিঁতুর জ্বল্ জ্বল্ করছে। তার পিছনে শৈলেশের সঙ্গে পার্ব্বতীর একটিবার মাত্র চোখোচোখি হ'ল। স্ত্রীর অলক্ষ্যে শৈলেশ নিঃশব্দে তাকে একটি নমস্কার করল, পার্ব্বতী উমার সুমুখে সে নমস্কারের কোনো প্রত্যুত্তরই দিল না, শুধু নিমেষমাত্র কি যেন চিন্তা করে' বল্‌ল, স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিস্?

মাঝামাঝি খানিকটা ব্যবধান রেখে শৈলেশ এগিয়ে চল্‌তে লাগল। উমা বলল, হ্যাঁ, দিল্লী আগ্‌রা এলাহাবাদ সব হয়ে এলাম—এবার ফেরবার মুখ। কিন্তু—উঃ কতদিন ধরে' তোকে যে স্বপ্ন দেখেছি পার্ব্বতী, তাই ভাবি। এখন আর স্বপ্নেও তোকে পাইনে। কেমন আছিস বল্? এ দেশে বিয়ে হয়েছে? বেশ! স্বামীর সঙ্গে বেরোসনি কেন? স্বাধীন হয়েছিস বুঝি খুব? নাম কি স্বামীর?

পার্ব্বতী হেসে বল্‌ল, ঝড়ের চেয়ে ছুটছিস যে! বলি এ দেশে কি জন্যে? হাওয়া খাবার জায়গা কি আর জুটলো না পৃথিবীতে? তীর্থ করতে নাকি রে?

উমা হেসে বল্‌ল, হ্যাঁ, বুড়ো হয়েছি, কবে বলতে কবে—

পার্ব্বতী বল্‌ল, চল্, চল্‌তে চল্‌তে কথা বলি।

আরতি দেখা আর হ'ল না, সবাই মিলে আস্তে আস্তে হেঁটে চল্‌লো। পার্ব্বতী বল্‌ল, আরতি, পুজো, গঙ্গা নাওয়া, ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকা, এসব আমার আসে না ভাই, এদিকে ভক্তি-ছেদ্দা আমার বিশেষ নেই তা বলেই দিচ্ছি।

উমা চোখ বড় বড় করে' বল্‌ল, সেই মেয়ে তুই, তার কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়। পাড়ায় আমাদের সুনামের বহর কি রকম ছিল বল্ ত? বাপরে, কি মিথ্যেবাদীই তুই ছিলি ভাই!

পার্ব্বতী হাস্‌ল, হেসে বল্‌ল, তোদের বাড়ীতে সেই ময়ুয়া পাখীগুলো আছে? সেই জলি কুকুরটা? সেই লেজকাটা কোকিলটা ত মরেই গেল! তোদের সেই নেড়ি ঝি মুখপুড়ি বেঁচে আছে?

না ভাই, সে এই বছর দুই হ'ল—

বাঁচা গেছে। হতভাগি আমাদের নামে কি লাগানই লাগাতো!—তারপর একটু থেমে পার্ব্বতী আবার বল্‌তে লাগল, বড় বড় ঘটনা আমার মনে থাকে না ভাই। আমি শুধু ভাবি আমাদের সেই বেলতলার ছাদ, শ্যাওলাপড়া পাঁচিল, অপরাজিতার চারা, আমি ভাবি ভিতরে ফাটলে চামচিকের বাসা।

কোন্ দিকে যে সবাই চলেছে তার কোনো ঠিক নেই। পার্ব্বতী তার অতীত জীবনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগল, সামনে যাদের কোনো সম্বল নেই তারাই পিছন দিকে তাকায়। মনে পড়ে চিল-কোঠার মধ্যে আমরা বউ-বউ খেলতাম। দূরের মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদ, সুপুরি গাছে ঘুঘু ডাকত। বর্ষাকালে মেঘ জম্‌লে আমাদের বেলতলা অন্ধকার হয়ে আসত, ঝড় বইতে সুরু করলে আমরা গায়ের আঁচল উড়িয়ে ময়ূরের পেখম খেল্‌তাম!

উমা অবাক হয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে পথ চলছিল। শৈলেশ আগে আগে চলেছে।

পার্ব্বতী এক সময় বল্‌ল, তোর বর কি করেন উমা ?

উনি ভাই ডাক্তার !

ডাক্তার ?

হ্যাঁ, আচ্ছা কই তোমার স্বামীর কথা কিছু বললে না ত ?

পার্ব্বতী হেসে বল্‌ল, আমার উনিও ভাই ডাক্তার। পসার খুব—দিনে রাতে এতটুকু বাবুর সময় নেই। সবাই কিন্তু ভালবাসে, আমার কানের কাছে কেবলই বলে, অমন ডাক্তার আর হবে না। যেমন রূপে কার্ত্তিক, তেমনি গুণে—

উমা সলজ্জ ভাবে বল্‌ল, ওঁর কথা আর বলো না ভাই, এইটুকু শুধু জানি, মাসে একটি করে' রুগীও ওর কাছে আসে কিনা সন্দেহ।

পার্ব্বতী বল্‌ল, আমার এঁর কথা ছেড়েই দাও। বোম ভোলানাথ। আমাকে নৈলে এতটুকু চলে না। এই যে বেড়াতে এসেছি, ব্যস্—ফিরে গিয়ে দেখ্‌ব হয়ত' মাথায় হাত দিয়েই বসে আছেন। পুরুষ মানুষে একবার ভাল বাসলে আর রক্ষে নেই।

পাছে অগ্রগামী শৈলেশ শুনতে পায়, উমা চট করে' পার্ব্বতীর গা টিপে দিল। পার্ব্বতী আর একটু গলা নামিয়ে বল্‌ল, আজ ত' দেখছ আমি এই অবস্থায় এসেছি, কিন্তু উনি যেদিন সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন—এই একেবারে ঠিক তোমাদের মতন ভাই···সেজে গুজে···রাস্তার লোকেরা পর্য্যন্ত তাকিয়ে থাকে। পুরুষরা অমনিই

উমা, ইনিই বল আর তিনিই বল, কেমন করে' ভাল বাসুছি এ তাঁদের দেখানই চাই।

উমা বল্‌ল, তাঁর বয়েস বুঝি অল্প?

হ্যাঁ, এই আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় আর কি। তোকে ভাই দেখাতে ইচ্ছে করে। ছিপ্‌ছিপে, ফর্সা, চশমা চোখে, গোঁফ কামানো, চোখ দুটি সরল, হাসি-হাসি মুখটি, কালো-কালো কোঁকড়ান চুল—হঠাৎ উমার মুখের দিকে চেয়ে পার্ব্বতী বল্‌ল, তোমার বরের সঙ্গে বেশ আদল আসে ভাই।

উমা বল্‌ল, ছেলেপুলে এখনো হয়নি ত?

ছেলে!—অকস্মাৎ যেন পার্ব্বতীর চমক ভাঙলো। ঘাড় হেঁট করে' মাথা নেড়ে জানাল, হয়নি।

আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দু'জনে চল্‌তে লাগল। কথা খুঁজে না পেয়ে এক সময় উমা বল্‌ল, যতদিন না হয় ততদিনই ভাল, তা সে যে যাই বলুক।

পার্ব্বতী বল্‌ল, হুঁ।

উমা বল্‌ল, কালকেই আমাদের চলে' যেতে হবে, নৈলে তোমার ওখানে একদিন বেড়াতে যেতাম ভাই।

কালকেই চলে' যাবে? ইস্‌, আমিও ভাবছিলাম তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করে' নিয়ে যাবো, দেখতে তোমার ভগ্নিপতিটি কেমন সৌখীন। তাঁর হাতে পড়ে' আমারো তাই। দু'জনে

মিলে দিনরাত 'কেবল ঘরই সাজাচ্ছি। ঘরটি আমাদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। সামনে ফুলবাগান, দিনরাত গন্ধে ভুর ভুর করে। তাঁর পাগলামি শুন্‌লে তুই হাসবি ভাই। রোজ একটি করে' বকুলের মালা তাঁর জন্যে গেঁথে রাখা চাই। বিছানা হবে রোজ ফুলশয্যে। এমন জায়গায় হবে যেন চাঁদের আলো এসে পড়ে। জান্‌লার ধারে নিমগাছ, তার তলায় রজনী-গন্ধার বন।

মুখ টিপে হেসে উমা বল্‌ল, ডাক্তার মানুষের এমন কবিত্ব!

পার্ব্বতী নিজের মনেই তখন বলে' চলেছে, তাই ঘরটির ওপর আমারো ভাই মায়া পড়ে গেছে। ওটি আমাদের দু'জনের সৃষ্টি। আমাদের দুঃখের দিনে ও আমাদের কোলে করে' রাখে। মিট্‌-মিট্‌ করে' আমাদের ঘরে যখন আলো জ্বলে, ভাবি, কাঙালিনী মা যেন আলো হাতে নিয়ে সন্তানের পথ চেয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে মাটির সোঁদা গন্ধ পাই; ভিজে হাওয়ার আমেজ চোখে মুখে লাগে, আনমনা ভোরের হাওয়া চলাচল করে···উমা, আমি সত্যিই সুখী ভাই!

তার আবেগ-বিহ্বল মুখখানির দিকে তাকিয়ে উমা বল্‌ল, কি বল্‌লি পার্ব্বতী? সুখী?

হ্যাঁ, সুখী, কেন না আর আমাদের কোনো দুরাশা নেই, আমরা আর কোথাও হাত পাতিনে, মানুষের কাছেও না,

মানুষ যাঁর সৃষ্টি তাঁর কাছেও না! শুনবি তবে?—পার্ব্বতী উজ্জ্বল হাসি হেসে কম্পিত দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, হয়ত তখন আমরা ঘুমের ঘোরে, মনে হয় আস্তে আস্তে আমাদের ঘর খানি এই দুঃখের পৃথিবী থেকে বাঁধন খুলে' নিয়ে শূন্যলোকে উড়ে যেতে থাকে, চিত্রলেখার গল্প শুনেছিস ত' ঠিক তেমনি, দুলতে দুলতে হেলতে হেলতে মেঘ-লোকের ওপারে চলেছি···স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের সন্ধিস্থল; দুঃখ নেই, দাহ নেই·· শুধু আমরা উধাও হয়ে চললাম ··তারপর জেগে উঠে দেখি, ও হরি, তেমনিই আছি। সেই আলো, সেই দক্ষিণের জানলা খোলা, তেমনি রজনীগন্ধার গন্ধ, নিমগাছটি ঝির ঝির করছে—হয়ত বা বর্ষার জলো হাওয়ায় বিছানার একদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ··

উমা বল্ল, আমরা চলেছি কতদূর? তোর বাড়ী কোন্‌দিকে পার্ব্বতী?

পার্ব্বতীর যেন চমক ভাঙলো, অন্ধকার পথে সে তার স্বপ্নময় দৃষ্টি প্রসারিত করে' একবার চারিদিকে তাকাল। সে যেন সমস্তই ভুলে গেছে।

পার্ব্বতী?

কি রে?

উমা অন্ধকারে তার মুখের দিকে হঠাৎ মুখ তুললো। বল্ল, কাঁদচিস নাকি?

পার্ব্বতী হেসে বল্‌ল, ও কিছু না, রাত হলেই আমার চোখে জল আসে।

উমা চুপ করে' রইল।

পার্ব্বতী বল্‌ল, আচ্ছা ভাই, এবারের মতন তাহলে—এই যে, মিশ্রিপুকুর ছেড়ে এসেছি, আর নয়।—একটু পথের পাশে সরে' এসে অকস্মাৎ সে উমাকে জড়িয়ে ধরে' চুম্বন করে' বল্‌ল, মনে রাখিস, চল্‌লাম।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে পিছন ফিরল। যে পথে এতক্ষণ এসেছিল, সেই পথ ধরেই তাকে আবার ফিরতে হবে। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে সে একবার থমকে দাঁড়াল, কিয়দ্দূরে উমা ও শৈলেশের দু'টি অস্পষ্ট মূর্ত্তি একত্র মিলেছে, সেই দিকে তাকিয়ে তার চোখের পলক যেন আর পড়ে না।

সেইখানে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টি তার প্রসারিত হয়েই রইল; পায়ে যেন তার অপরিসীম ক্লান্তি ও নিরুৎসাহ জড়িয়ে গেছে। এইখানে এই পথের ধারে দাঁড়িয়েই যেন ধীরে ধীরে তার চোখের তীরে সন্ধ্যার মত অবসন্ন তন্দ্রা নেমে আসবে।

*

* *

দু'জনে অনেকক্ষণ বাসায় ফিরেছে। শৈলেশ সেই থেকে চুপ করে' বারান্দায় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল, এতক্ষণ

পর্য্যন্ত সে একটিও কথা কয়নি। দূর আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, আর একদিকের সমস্তটাই আব্‌ছা অন্ধকার। আকাশে তারা নেই, পশ্চিম দিকটায় মেঘ করেছে; বোধ হয় ভারি রাতে বৃষ্টি নাম্‌বে।

পিছনে এসে উমা দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস্‌ করল, খাবার দেবো?

উত্তর না পেয়ে একটু বাদে উমা আবার বল্‌ল, আজ যে বড় চুপ চাপ?—পার্ব্বতীকে দেখলে? কেমন মেয়ে বল ত'?

শৈলেশ শুধু বল্‌ল—হুঁ!

উমা পিছন থেকে ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ এনে বল্‌ল, কি ভাবচো শুনি?

শৈলেশ বল্‌ল, তোমার পার্ব্বতীর কথাই ভাবচি।

কি আশ্চর্য্য, তুমি যে তার কথা ভাবছিলে এও আমি ভাবছিলাম। চমৎকার মেয়ে পার্ব্বতী।

হ্যাঁ, চমৎকার!—বলতে বলতে শৈলেশ উঠে দাঁড়াল, ''এপর বল্‌ল, কত গল্পই ত' করে' এলে। জিজ্ঞেস করলে না কেন—পার্ব্বতী, তোমার দিন চলে কেমন করে'?

দুটি সরল দৃষ্টি তুলে' উমা বল্‌ল, সে কি, সে যে মেয়েমানুষ—আমার দিন চলে কেমন করে'?

শৈলেশ চট্‌ করে' ঘাড় ফেরালো। বল্‌ল, মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্রের আলোচনা করতে আমার লজ্জা হয় উমা, জানো ত'?

কিন্তু পার্ব্বতী—ওর স্বামী যে—

স্বামী?—হাঃ হাঃ করে' শৈলেশ হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বল্‌ল, স্বামীই যদি থাকবে তবে ঘুরে বেড়ায় কেন যেখানে সেখানে, মন্দিরের চত্বরে পড়ে' থাকে কেন রাতের বেলা?

মনে হ'ল কে যেন উমার টুঁটি টিপে ধরেছে।

শৈলেশ নিজের মনে আবার হাসতে লাগল,—স্বামী, স্বামীও যখন-তখন রাস্তায় কুড়িয়ে পায়! সেবার আমার এক বন্ধুকে নিয়ে ও কেমন করে' ছিনিমিনি খেলেছে তা কি ভুলে' গেছি?

আকাশে দুর্য্যোগ ততক্ষণে আসন্ন হয়ে এসেছে।

নারায়ণ

পরিচয় : একটি কৃপণ ও সঞ্চয়ী মেয়ের চরিত্র-বর্ণনা এই গল্পের প্রতিপাদ্য।

দরিদ্র বটে কিন্তু হতশ্রী নয়। স্বচ্ছন্দ শৃঙ্খলায় দারিদ্র্যকে চেনা মাঝে মাঝে কষ্টকর হয়ে ওঠে।

ছোট্ট সাজানো একখানি ঘর, পরিচ্ছন্ন একটুখানি রাঁধবার জায়গা, দক্ষিণ দিকে রেলিং-ঘেরা এক ফালি বারান্দা, গাব-গাছ আর কেষ্টকলির চারা বসানো এক টুকরো উঠোন, কলতলার ওদিকে একটি শিউলি ফুলের গাছ।

স্বামী আর স্ত্রী! তা বাইরে ছোটখাটো একটু আধটু বিরোধ থাকলেও একটি বড় ঐক্য দুজনের মধ্যে দেখা যায়। খিটিমিটি তাদের যদি বা বাধে সেটা মেলবার জন্তই।

কোথায় বড় একটা কাপড়ের দোকানে অনাথ হিসাবের খাতা লেখে। সকালে বেরোয় আর ফেরে সেই রাত দশটায়। নিরীহ বেচারা। কোনো রকমে টিম্ টিম্ করে' বেঁচে থাকাই যেন তার পরম সার্থকতা! অথচ এদিকেও সে শিব-প্রকৃতির। বেরোবার সময় স্নান করে' মাথা আঁচ্ড়াতে সে প্রায়ই ভুল করে, তরকারী আলুনি হলেও নির্ব্বিবাদে সে আহার করে' যায়, ফর্সা কাপড়ের ওপর ময়লা জামা চড়িয়ে ভুলক্রমে খালি পায়েই বেরিয়ে পড়ে—খানিক পথ গিয়ে জুতোর কথা মনে পড়তে আবার ফিরে আসে অবশ্য। বন্ধু-বান্ধবের কাছে আড্ডা দিতে গেলে ঘর ও ঘরণীর কথা তার মনেই থাকে না।

ভামিনী অত্যন্ত সুন্দরী।

কিন্তু কোথায় যেন একটা তার খুঁৎ আছে। খরচের ভয়ে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশদিন সে রাত্রে রাঁধে না। বলে—ওবেলায় যা খাওয়া হয়েছে—বাবা রে! পেট একেবারে হাঁসফাঁস!—হে-উ……তোমারও ত পেট ভরা রয়েছে দেখছি, যাও শুয়ে পড় গে। নয় ত খৈ এক মুঠো আছে, দেবো?

অনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকিয়ে বলে—খৈ? এক মুঠো? …থাক্ গে, দাও তবে এক ঘটি জলই দাও।

মেয়েটি এমনিই। ন্যায্য খরচ বাঁচানোটা যেন তার তপস্যা। স্বামীর অজ্ঞাতে এক একটি আধ্‌লা জমিয়ে সে নাকি দশ টাকা করে' তুলেছে। নানা উপায়ে সংসার থেকে আধলা-পয়সা বাঁচিয়ে সে আপন গৃহসজ্জার হরেক রকমের সৌখীন জিনিস কিনে আনায়। এবং আনায় অত্যন্ত বিশ্বাসী লোককে দিয়ে—যে তার পয়সা চুরি করবে না। স্ত্রীলোককে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে' চলে। স্বামী যতক্ষণ বাড়ী না থাকে ততক্ষণ সে আজে-বাজে ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে' বেড়ায়। পাছে ময়লা হলে' সাবান খরচ হয় এ জন্য গায়ে সেমিজ পরে না,—আব্রু যদি একটু ক্ষুণ্ণ হয়…তা হোক, কে আর তার দিকে হাঁ করে' চেয়ে আছে!

বলে—যার জমা কিছু নেই তার লক্ষ্মীশ্রীও নেই! কিছু থাকলে তবে কিছু আসে। বুঝলে?

মৃদু বিনীত কণ্ঠে অনাথ বলে—তা বলে' উপোস করে' পয়সা জমানোটা—

ওই ত! উপোসটাই তোমার কাছে বড় হয়ে উঠলো; কই দেখাও দেখি মচ্চি-মনোহরা খেয়ে ফতুর হওয়াটা কোন্ শাস্তরে লেখা আছে? তুমি বড় পেটুক, তা তুমি যাই বল। অথচ পেটুক লোকের চেহারা ভাল হয়। তোমাকে এত খাওয়াই অথচ দিনকে দিন—

এমনি তার সব তা'তেই।

বলে—এই নতুন বর্ষায় জুতোটা যে গেল। নতুন জুতো!

এবার প্রতিবাদ করতেই হয়। অনাথ বলে—নতুন? গেল বছর ঠিক এম্‌নি সময়—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কবে কি খরচ করচি সে আমার বেশ মনে আছে। মোট ত এক বছর হয়েছে, আড়াই টাকার জুতো আড়াই বছর চলে না? দোকান আর বাড়ী, বাড়ী আর দোকান—এই ত খাটুনি। বিষ্টির দিনে আমি তুলে রেখে দেবো তা বলে' রাখছি। আর ভাঙা রাস্তায় যদি খোয়া দিয়ে থাকে ত হাতে করে' নিয়ে ওইটুকু পার হয়ে যেও—বুঝলে?

স্বামীর প্রত্যেকটি খরচ সম্বন্ধে এমনি তার কৃপণতা এবং এতখানি তার আধিপত্য।

কিন্তু তার সখ নেই এত বড় অপবাদ শত্রুতেও দেবে না।

ঘরের ভিতর ঢুকলে ঠিক তাই মনে হয়। ঝক্‌ঝকে দেরাজ-আল্‌মারি এবং সুবিন্যস্ত খাট বিছানার দিকে তাকালে তার সুন্দর পেলব দুটি করতলের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দেয়। আসবাব-পত্রগুলি সে পরিষ্কার রাখে কিন্তু ব্যবহার করে না। বিছানা পেতে রাখে কিন্তু মাটীতে শোয়। নতুন তোয়ালে-গামছা টাঙানো রয়েছে, সে কিন্তু ছেঁড়া কাপড়েই মাথা মোছে। এসেন্স্‌, পমেড্‌, মাথার সুগন্ধী তেল, পাউডার, স্নো, ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, আয়না-চিরুণী-বুরুশ—সমস্তই আন্‌কোরা এবং অব্যবহৃত অবস্থায় চারিদিকে সাজানো রয়েছে। ভাল কোনরূপ ছবি সে রাখে না কারণ কোনো নিষ্প্রয়োজনের বস্তু উপভোগ করবার মত স্পৃহ তার নেই। দু'হাত দিয়ে সে যা পায় তাই তার একান্ত আপনার। এবং এই অধিকারের আনন্দে সে মাঝে মাঝে এসে এদিক ওদিক চেয়ে তার এই সাজানো বাগানের মধ্যে, পায়চারি করে' হেসে চলে' যায়।

যৌবনের প্রাচুর্য্য তার সর্ব্বাঙ্গে ঢল্‌ ঢল্‌ করে। হাজার হোক বয়স খুব কাঁচা। রাত্রে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনাথের যদি একটু নেশা ধরে ত অমনি সে সুবিধা নেয়।

ভূমিকা করে' প্রথমে বলে—ঘাটে আজ চমৎকার সিঁদুর কৌটো দেখে এলাম। অনেক দাম। জার্ম্মান সিল্‌ভার। বলে—চার আনা।

এত অল্প আয় থেকে হট্ করে' চার আনা দামের কিছু কেনা চলে না। অনাথ চুপ করে' থাকে। একটু পরে হাসিমুখে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—না কিনলেই চল্‌বে না ?

ভামিনী মুখ ফিরিয়ে একটু সরে' গিয়ে বলে—যখন তখন বুঝি আজকাল তোমার···ওসব চল্‌বে না! আগে বল অমনি একটি কৌটো কিনে দেবে ?

কৌটো ত তোমার অনেকগুলো আছে!

তা হোক! আর একটি থাকতে নেই ? আমি ত আর ব্যাভার করে' নষ্ট করবো না! অমনি সাজিয়ে রেখে দেবো। বল দেবে ?

আচ্ছা আচ্ছা, দেবো।—ব'লে হেসে অনাথ তাকে আবার কাছে টেনে নেয়।

একটু পরে নিজেকে মুক্ত করে' উঠে গিয়ে সে অনাথের পকেট থেকে চার আনার পয়সা বার ক'রে আনে।

অবাক হয়ে অনাথ বলে—সত্যিই নিলে ?···বিক্রি ?

আঁচলে পয়সা বাঁধতে বাঁধতে ভামিনী মৃদু মৃদু হাসে। অর্থ-গৃধ্নুতাই যে ভালবাসাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করে এ জ্ঞান বুঝি মেয়েটির নেই!

অনাথ বলে—বেশ ত তুমি! কড়ি না ফেল্‌লে বুঝি তেল মাখতে দেবে না ?

ভামিনী বলে—তা কি! আমি বাপু মেয়ে মানুষ। সঞ্চয় করা আমাদের অভ্যেস। কাউকে ফাঁকি দিয়ে ত আর কিছু জমাচ্ছিনে!

অনাথ বলে—বাইরের লোকে কিছু মনে কর্ত্তে পারে! এই ত কিরণ আসছে একদিনের জন্যে, আজ দোকানে বসে' চিঠি পেলাম—

ভামিনী বলে—তোমার কুটুম্বদের অতিথি হওয়ার জ্বালায় আমি কিন্তু আর বাঁচিনে!

অনাথ একটু হেসে বলে—অতিথি যে নারায়ণ! তা ছাড়া তাতে তোমার লাভই ত হয়!

ফিক করে' ভামিনীও হেসে ফেলে,—তা হয়। কিছু দেয় বৈ নেয় না। সেই সেবার মামাশ্বশুর কদিনের জন্য এসে আমার মুখ দেখার নাম করে' কত কি জিনিস পত্তর,—আচ্ছা, তোমার কিরণ-ভাইকে সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, না?

হুঁ।

কথাটা ওইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি। রান্না-বান্না চড়াবার চেষ্টা চলেছে। টিপে টিপে হিসেব করে' খুঁটিনাটি ধরে' দিয়ে ভামিনী স্বামীকে বাজারে পাঠালো। এবং বাজার থেকে অনাথ যখন ফিরে এল সে তখন আবার হিসেব বুঝে নিতে বসে' গেল। বলল—মেছুনি
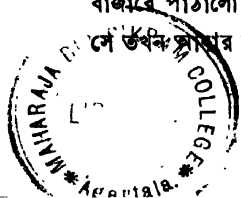
ফড়েনি মাগিরা ভাল মানুষ পেয়ে ঠকায়, আমি কিছু বুঝিনে? বরং পুরুষ মানুষে ঠকালে সহ্য হয় কিন্তু মেয়েমানুষে—কে? ওই তোমার কিরণ-ভাই এল বুঝি, উঠে গিয়ে দেখো দেখি?

স্যুট্‌কেশ হাতে করে' একটি যুবক উঠোন পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বল্‌ল—বৌদি, প্রণাম হই। ভাল আছ ত?

ঘাড় নেড়ে ভামিনী বল্‌ল—তুমি?

হ্যাঁ, ভাল আছি। তারপর অনাথ দা? খবর কি? বেশ গুছিয়ে সংসার করছ দেখছি; সুন্দরী বৌ পেলে কি আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়?

অনাথ হেসে বল্‌ল—আয়। বলে' দুজনে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

অনেকদিন অদর্শনের পর অনেক গল্পই দুজনের মধ্যে চল্‌লো। হঠাৎ আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কিরণ বল্‌ল—কাজ কর্ম্ম বড় মন্দা পড়েছে ভাই, অর্ডার সাপ্লাই করেছি, এদিকে টাকা আদায় করতে এসেছিলাম। আবার কালকেই—

তারপর বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা হল'।

ভামিনী দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। বল্‌ল—স্নান করে' নাও ভাই, বেলা অনেক হয়েছে।—ব্যাগের মধ্যে কি আছে তোমার?

কিরণ হেসে বল্‌ল—ভয় নেই বৌদি, তোমার যোগ্য উপহার ওতে কিছুই নেই!

না, সে কথা আমি বলছিনে। আমি কি এতই হ্যাংলা?—ভামিনী মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে' গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে কিরণ বল্‌ল—এখান থেকে হয়ে আমাকে একবার বর্দ্ধমান যেতে হবে অনাথদা। ব্যাগ থেকে আর কাপড় বা'র করবো না—এই যে কাপড় এখানে রয়েছে একখানা, এইখানা পরেই স্নান করে' আসি। কেমন?

সাবান-কাচা পরিষ্কার ধুতি আন্‌লায় টাঙানো ছিল, হ্যাঁচ্‌ করে' সেখানা পেড়ে নিয়ে কিরণ কাপড় ছাড়তে লাগলো। ফর্সা তোয়ালে খানাও টেনে নিল। জান্‌লার পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে সেদিকে একবার তাকিয়ে মেঘের মত মুখ নিয়ে ভামিনী আবার রাঁধতে লাগ্‌লো। গালে যেন কে তার চড় মেরেছে।

তোমার আবার বাগান করবার সখ আছে দেখছি অনাথদা! কি কি গাছ বসিয়েছ দেখি?—বারে, শীতের হাওয়া না পেয়েও গাঁদা ফুল ধরেছে! আর ওটা কিসের চারা?

অন্য দরজা দিয়ে কিরণ বেরিয়ে যেতেই তীরবেগে ভামিনী এসে ভিতরে ঢুকে চুপি চুপি বল্‌ল—এই জন্যেই কি কাপড়গুলো ফর্সা করে' রেখেছিলাম? তুমি বোকার মতন অম্‌নি হাঁ করে' রইলে? ওরে আমার ভাই রে! অমন ধব্‌ধবে আমার তোয়ালেখানা—

পায়ের শব্দ পেয়েই আবার সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল,

পিছন থেকে হেসে কিরণ বল্ল—আরে শোনো বৌদি শোনো, না হয় মানলাম তোমার মতন সুন্দর মুখ আমার চোখে পড়েনি, তা বলে' চোখ দিয়ে কি ভাল করে' দেখতেও পাবো না? অনাথদা, তুমি কিন্তু যাই বল ভাই, এত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি।

নিজের নির্ব্বোধ রসিকতায় সে নিজেই হেসে উঠলো। মিনিট খানেক নির্ব্বাক হয়ে থেকে যাবার সময় ভামিনী বলে' গেল—এ তোমার ঠাট্টা না মনের কথা ঠাকুরপো?

কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন কিরণ মনেই করে না। সে ভাবে তার কথা সে ছাড়া আর কারো বোঝবার শক্তি নেই।

একটু হেসে সে বল্ল—এই যে, ভাল মাথার তেল রয়েছে দেখছি, অনেক দিন খোসবাই তেল মাথা হয়নি—বলতে বলতেই সে নতুন তেলের শিশিটা খুলে ফেলে ঢক্ ঢক্ করে' হাতে ঢাল্‌তে লাগলো।

—কি সাবান এখানা? বাঃ 'গড্‌রেজ্' দেখছি। আচ্ছা ভালো কথা, নতুন জিনিস, আমার হাত দিয়েই বউনি হোক; কি বল অনাথদা?

অনাথ একটু হাসলো। সাবান-তোয়ালে হাতে নিয়ে কিরণ বেরিয়ে গেল।

ভিতরে ঢুকে নিশ্বাস রোধ করে' ভামিনী বল্ল—কেমন?

হ'ল ত? বলেছিলাম তখন? এইবার নেপোয় এসে দই মেরে গেল! এমন সর্ব্বনাশ আমার হবে না ত কা'র হবে!—ছল্‌ছলে দুটি চোখে ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে সে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিরণ তখন পরমানন্দে স্নান করছে। মুখ বাড়িয়ে একবার ভামিনী দেখলো, মেখে মেখে সাবানখানা এরই মধ্যে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে! সাবানটির দাম সাড়ে পাঁচ আনা!

অনাথ তখন অতি কষ্টে হাসি চেপে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে বসে' আছে। বসে' আছে ঠিক চোরের মত।

স্নান করে' ঘরে ঢুকে কিরণ বল্‌ল—যাক গে, এমন হয়েই থাকে। অনাথদার দিনকাল আজকাল ভালই যাচ্ছে। কি বল অনাথদা?

একটু হেসে অনাথ বল্‌ল—কি হ'ল রে?

উত্তর শোনবার জন্য জান্‌লার পাশে কান খাড়া করে' ভামিনী তখন তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

কিরণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্য-কণ্ঠে বল্‌ল—বাল্‌তির কানায় লেগে এই কাপড়খানা খানিকটা ছিঁড়ে গেল ভাই। কাপড়খানা নতুন মনে হচ্ছে!

মুহূর্ত্তের জন্ত স্বামী-স্ত্রীতে চোখচোখি হল'। তারপর ভামিনী

নিজেই সরে' গেল। মনে হল', কাপড়ের সঙ্গে তার গায়ের খানিকটা মাংসও কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে।

তবু থালায় করে' সাজিয়ে সেই অতিথিকে ভাত বেড়েও দিতে হল।—

অনাথও স্নান করে' ফিরে আসছিল, এমন সময় ঝনাৎ করে' ঘরের মধ্যে শব্দ হতেই ভামিনী তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিরণ বল্‌ল—আজ কি যে আমার হয়েছে কে জানে! নতুন আরসিখানা,—ছি ছি!

পুরু কাঁচের দামী আরসিখানি তখন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে।

ভামিনীর পায়ের তলাকার মাটী তখন সরে' যাচ্ছে। চোখের সাম্‌নে ঘরখানা দুল্‌ছে। তবুও এক হাতে চৌকাঠ ধরে' গলাটা পরিষ্কার করে' কোনো মতে বল্‌ল—আহা, কি বুদ্ধি ছেলের! বিছানা থেকে ফর্সা চাদর তুলে নিয়ে বুঝি অম্‌নি করে' মাথা মুছতে হয়? মা-বাপের দাম্বেলে ছেলে ছিলে, না ঠাকুরপো?

কিরণ বল্‌ল—এখন মনে হচ্ছে বৌদি, দাম্বেলে দেওরও বটে।

অনাথ তখন খেতে বসবে কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবে তাই ভাব্‌ছিল।

ভামিনী বাইরে এসে দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল—ঘাড় গুঁজে বসে' রইলে কেন ? পেটুকের আবার খাওয়ায় অরুচি আছে নাকি ?

নাঃ এই যে !—বলে' স্ত্রীর মৃদু তীক্ষ্ণ ধমকের উত্তরে ঈষৎ হেসে অনাথ বল্‌ল—কিরণ, আয় রে।

যাই।—বলে' চাদরখানা জড়সড় করে' এক পাশে রেখে কিরণ এসে খেতে বসলো। বল্‌ল—চিরুণীখানা কিন্তু কিনতে গিয়ে তুমি ঠকেছিলে অনাথদা। নৈলে নতুন চিরুণীর দাড়া অত সহজে ভাঙে না। আচ্ছা, ঐ পমেডটার দাম কত নিয়েছিল ? এতখানি মাথায় মাখলাম তবুও চুলগুলো তেমন যুৎসই হ'ল না !

অতি কষ্টে ভামিনী বল্‌ল—আর মুখে ? মুখে কোন্‌টা মাখা হল' !

মুখে তোমার ওই 'স্নো' দিলাম ; দাড়ি কামিয়েছি কিনা। তা ছাড়া আমাদের মুখে ওসব মাখা দরকার বৌদি, নৈলে তোমার মতন সুন্দর মুখখানি পেলে আমরাও—

সমস্ত গা-টা যেন ভামিনীর রি রি করে' কেবলই জ্বল্‌ছিল। বল্‌ল—তা যা বলেছ, সে একশোবা'র ! তবে বাজারের দামের চেয়ে গরীব লোকের 'স্নো'য়ের দামটা আর একটু বেশি। তা'ছাড়া ভগবান যাকে রূপ দেন নি সে হাজার চেষ্টা কল্লেও—

এটা বোঝ' ত বুদ্ধিমান ছেলে!—বলে' আগুনের মত এক ঝলক হেসে সে সরে' গেল!

দুজনে খেতে বসলে ভামিনী একবার শোবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কোনোদিকে আর ফিরে তাকাবার উপায় নেই। চারিদিকে যেমন বিশৃঙ্খলা তেমনি ছন্নছাড়া। নতুন চাদর আর কাপড় মাত্র সেদিন কেনা হয়েছে, এখনো তার দেনা শোধ হয় নি। বড় সাধের পরিষ্কার শাড়ী কাপড়খানি সে রাধাষ্টমীর দিন পর্‌বে বলে' তুলে রেখে দিয়েছিল, সেখানি ধূলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। চুল বাঁধবার সরঞ্জামগুলির ওপর যেন এর মধ্যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেছে। তার বড় আদরের কাঠের ফ্রেমে আঁটা আয়নাটি—উহু, ইস্!

পা বাড়াতেই ভাঙা আয়নার এক কুচি কাঁচ কেমন করে' হঠাৎ পায়ের তলায় ফুটে যেতেই সে পা ধরে' মাটীতে বসে' পড়্‌লো। ক্ষতস্থানটা দিয়ে তখন গল্ গল্ করে' রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

কিরণ বাইরে থেকে তখন ডাক্‌ছে—বৌদি, তরকারি ফুরিয়ে গেল। এই মাছের ছ্যাঁচ্‌ড়াটা ভারি চমৎকার হয়েছে। যদি আর একটুখানি—

দাঁতে দাঁত চেপে ভামিনী বল্‌ল—যাচ্ছি ভাই।

তরকারি এনে যখন সে কিরণের পাতে ঢেলে দিল, অনাথ

তখন বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক। সে ঠিক জানে, মাথা গুণে ভামিনী তরকারি রাঁধে। দুবার করে' কোনো জিনিস চেয়ে খাওয়া এ সংসারে একেবারে নিষেধ। সে যে নিজের ভাগটুকুই এনে দিয়েছে, এ কথা বুঝতে অনাথের এতটুকু বিলম্ব হল' না।

আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ভামিনী যখন ভাঙা কাঁচের কুটিগুলি ঝাঁটা দিয়ে একত্র করতে লাগল তখন তার আয়ত দুটি চোখ অতিরিক্ত রাগে হু হু করে' জ্বালা করছে। বিনা দোষে বন্দী করে' কে যেন তাকে চাবুকের বাড়ি সপাসপ প্রহার করতে সুরু করে' দিয়েছে।

বিকাল বেলা অতিথি-নারায়ণ বিশ্রাম করে' উঠলেন। বাইরে তখন একটু একটু মেঘ করে' এসেছে। শিগ্রই বৃষ্টি নামবে।

দোরের চৌকাঠের কাছে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে' ভামিনী বসে' ছিল। আজ সমস্ত দিন সে জলগ্রহণ করে নি। নিজের ভাতগুলো সে আঁস্তাকুড়ে কুকুরের মুখে দিয়ে এসেছে। জীবের প্রতি তার দয়ার এই বোধ করি প্রথম প্রকাশ।

হাসতে হাসতে কাছে সরে' এসে কিরণ বল্‌ল—বর্ষার দিনে মনটা বুঝি আন্‌মনা হয়ে উঠেছে বৌদি?

কোনো উত্তর না পেয়ে কিরণ কাছে এসে উবু হয়ে বসলো। বল্‌ল—এমন থম্‌থমে কেন? প্রাণেশ্বর-দাদা গেল কোথায়?

মুখ তুলে ভামিনী বল্‌ল—আর কোনো কাজ নেই বুঝি তোমার ?

নাঃ, তোমার কাছে বসলে কোনো কাজ করতে মন যায় না। বৌদি, সত্যি কথা বল্‌ব ? তোমাকে বেশ লাগে কিন্তু !

কুটুম্বের ছেলে ; কিছু বলাও চলে না। মাত্র এক দিনের জন্য এসেছে। ভামিনী মুখ তুলে একবার চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌ল—সত্যি নাকি ?

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে' সে নিজেই উঠে চলে' গেল।

যাই, ভারি গরম লাগছে, চান্‌ করে' আবার বেরোতে হবে। —বলে' উঠে শিষ দিতে দিতে কিরণ সরে' গেল।

টিপ টিপ করে' তখন বৃষ্টি পড়ছে। অনাথ কখন্‌ এর মধ্যে ফিরে এসেছে। তার নিরীহ মুখখানার দিকে চেয়ে ভামিনী উত্তেজিত হয়ে হাত পা নেড়ে চাপা তীব্র কণ্ঠে কি সব বলছিল। স্নান সেরে ঘরের মধ্যে কিরণ এসে ঢুকতেই সে চুপ করে' সরে' দাঁড়াল।

কিরণ বল্‌লে—বেশ বেশ, বিষ্টির দিনে এ ত' বেশ ভালই। স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হবে এতে বাইরের লোকের হিংসে করবার কি আছে ! অনাথদা, তুমি কিন্তু একটু স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছ ভাই, বৌদিকে ছেড়ে তুমি থাকতেই পারো না !

দূর গাধা !—বলে' হাসতে হাসতে ভামিনীর দিকে চেয়ে অনাথ আবার বল্‌ল—কথাবার্ত্তা কিন্তু কিরণের চমৎকার—দেখেছ ? ছোট বেলা থেকেই ও এমনি !

স্বামীর প্রতি একটা কটূক্তি ভামিনীর মুখে এসে আবার ফিরে গেল।

কাপড় জামা পরে' কিরণ বল্‌ল—দেখি, বৌদির এই এসেন্স্‌টা কেমন দেখি এবার। বেশ দামী এসেন্স্‌ দেখছি।

পকেট থেকে ছোট একটি ছুরি বা'র করে' শিশির ছিপিটা খুলে সে সকলের সুমুখেই একটু একটু করে' জামায়, কাপড়ে, রুমালে, মাথার চুলে, ওপরকার ঠোঁটে দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে মাখতে লাগলো। বল্‌ল—বেশ, সত্যিই গন্ধটা ভাল !—পরে শিশিটা হঠাৎ মুখের কাছে তুলে ধরে' বল্‌ল—আরে, একটু মাখতেই অর্দ্ধেকের ওপর খরচ হয়ে গেল ! সব জিনিস বেশী খরচ করা আমার স্বভাব হয়ে গেছে দেখছি।

তারপর সে তুলে নিল পাউডারের কৌটোটা। পাউডার মাখলে নাকি ঘাম-এর দাগ লাগে না।

এ দৃশ্য সহ্য করবার মত ধৈর্য্য ভামিনীর ছিল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জুতোটা পায়ে দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে কিরণ বল্‌ল—তাই ত,

বিষ্টিটা এখন ধরবে বলে ত মনে হচ্ছে না! তুমি এখন ঘরেই থাকবে ত অনাথদা?

অনাথ বলল—হ্যাঁ, কেন বল্ ত?

তোমার ওই ছাতিটা নিয়ে তাহলে' একবার ঘুরে আসি।—এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছাতাটা দেয়ালের হুক্ থেকে পেড়ে নিয়ে কিরণ মস্ মস্ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরতে তার একটুখানি রাত হয়ে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলো, আলোটা তখনও জ্বালা হয়নি। রাত্রে ভামিনী সচরাচর আলো জ্বালে না; রাস্তা থেকে গ্যাসের আলো খানিকটা এসে তার ঘরের মধ্যে পড়ে, তাইতেই এক রকম কাজ চলে' যায়। আজ কিন্তু একটি হারিকেন্-আলো সে তৈরী করে' দরজার কাছে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি এসে অন্ধকারে পা বাড়াতেই ঠোকা লেগে আলোটা কাৎ হয়ে গেল। কাঁচটা ভাঙেনি বটে কিন্তু আলো জ্বেলে কিরণ দেখলো, বগ্ বগ্ করে' কেরোসিন তেল পড়ে' মেঝেটা ভেসে গেছে।

ভামিনী এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্ল—আমার ভাই দোষ নেই, তুমিই পায়ের কাছে রেখেছিলে! যাক গে, কাল সকালে ওখানটা পরিষ্কার করলেই চলবে!—এই যে অনাথ দা, আজ ভাই একটা বড় অন্যায় করে' ফেল্লাম! আমায় ক্ষমা ক'রো।

দূর পাগ্লা, কি হয়েছে বল্ শুনি।

ছাতিটা তোমার নিয়ে গিছলাম জান ত? বিষ্টি ধরে' যাবার পর সেটার কথা আর মনেই নেই, কোথায় যে ফেলে এলাম কে জানে! পুরোনো হলেও বা কথা ছিল, কিন্তু নতুন জিনিসটা—

হারিয়ে গেল? তা, হ্যাঁ, ওটা এই কদিন আগে তিন টাকা দিয়ে—তা যখন গেছে তখন আর—

ভামিনী তার দিকে চেয়েছিল, অনাথের মনে হল' যেন সে বরফের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে! কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। কোনো রকমে কথাটা শেষ করে' সদর দরজার দিকে সে তাড়াতাড়ি চলে' গেল।

ক্রমে রাত হল'। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বেশী বিলম্ব হল' না।

শোবার জায়গা কিরণের বেশ যত্নসহকারেই করা হয়েছিল। খাট-বিছানা সমেত বড় ঘরটিই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাটের ওপর মশারি টাঙানো।

বল্‌ল—এমন বৌদি আর হবে না, বুঝলে অনাথ দা?—একটু হেসে আবার বল্‌ল—রূপটা তোমার, গুণটা কিন্তু আমাদের। তা সে যাই হোক, আমার ত এদিকে রাজশয্যে, তোমাদের কি ব্যবস্থা?

ভামিনী আর চুপ করে থাকতে পারল না। মুখে একটু

হাসি টেনে এনে বল্‌ল—পরের সুবিধে অসুবিধে দেখার অভ্যেস তোমার আছে নাকি ঠাকুরপো ?

ঠাকুরপোও হাসলো। হেসে বল্‌ল—তা নেই! কিন্তু তোমাকে পর বলে' যে মনেই হয় না বৌদি। তাই জন্যেই ত—

অনাথ এগিয়ে এসে বল্‌ল—ওই দেখ। কিরণ সে রকম ছেলেই নয়। তোমাকে ও কি কম ভালবাসে ? ছোট বেলা থেকে আমি ওকে দেখে আসছি যে—

কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার আর কথা সর্‌ল না; হঠাৎ ভয়ে নির্ব্বাক হয়ে বোকার মত সে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে গেল।

খানিক রাতে চোরের মত পা টিপে টিপে সে এসে দেখলো, রাঁধবার জায়গায় মুড়ি দিয়ে ভামিনী শুয়ে আছে। মনে হয় ঘুমোয়নি। খাবার জন্য সাধাসাধি করতে অনাথের কেমন যেন ভয় হল।

বল্‌ল—যাক্, আমিও এখানে শুয়ে পড়ি,. একটা রাত বৈত নয়! বালিশ একটা যদি ওঘর থেকে—ওকি, কাঁদচ কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ?

ক্লিষ্ট রুদ্ধকণ্ঠে ভামিনী বল্‌ল—আর আমি পাচ্ছিনে। কাল সকালেই ওকে তাড়িও। তিনটাকা দামের ছাতিটা—ইচ্ছে হচ্ছে

ছুটে গিয়ে যেখান থেকে হোক নিয়ে আসি! আমাকে ধরে' মারলে আমার এত দুঃখ হতো না।

ছাতার শোক চল্‌লো প্রায় দুঘণ্টা।

কিন্তু সকাল বেলার ব্যাপারটা সত্যিই করুণ।

মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিরণ বল্‌ল—ছি ছি, এবার আর আমাকে ক্ষমা করা উচিত নয়। এ রকম অত্যাচার করলে কি কোনো গেরস্থ ঠাঁই দেয়?

কেন রে? কি হল'?

কিরণ হেসে নিজেই বল্‌ল—এসো, দেখে যাও তোমার গুণধর অতিথির কীর্ত্তি।—বলে' অনাথকে ডেকে নিয়ে সে ঘরে ঢুক্‌লো।

খাটের ওপর মশারিটা টাঙানোই ছিল, সেটার একটা ধার কেমন করে' পুড়ে ফাঁক হয়ে গেছে! বিছানার চাদরটাতেও জায়গায় জায়গায় পোড়ার দাগ। অনাথ হঠাৎ ভামিনীর দিকে তাকিয়ে ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—এ কি করে' হল' রে?

কিরণ বল্‌ল—বোধ হয় দেশালাই জ্বাল্‌বার পর জ্বলন্ত কাঠিটা—

অনাথ মাথা হেঁট করে' রইল! দেখলো, মেঝেতে পোড়া সিগারেটের কয়েকটা কুচি, আর বিছানার ওপর সিগারেটের ছাই ছড়ানো!

ভামিনী হয়ত এবার ভয়ানক চীৎকার করে' উঠবে—এমনি তার মুখ-চোখের চেহারা !

টল্‌তে টল্‌তে অনাথ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে' গেল। তার মনে হল, শুধু মশারিই পোড়েনি, ভামিনীর বুকের ভিতরটাও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে' পুড়ে একাকার হয়ে গেছে।

তারপর অতিথির বিদায়ের পালা। সকালের গাড়ী, খেয়ে যাবার সময় নেই। কিরণ বল্‌ল—তা হোক, এখান থেকে এইটুকু বর্দ্ধমান। সেখানে গিয়েই,—কই, অনাথদা কোথায় গেলো ?

বলতে বলতে কিরণ বাইরে এসে দেখে, অনাথ চুপ করে' এক জায়গায় বসে' আছে। মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল—এ কি, চল্‌লি নাকি রে ? জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে দেখছি যে ?

একটু আম্‌তা আম্‌তা করে' কিরণ বল্‌ল—একটা কথা তোমায় বলছিলাম অনাথদা। তাগাদা করতে গিয়ে কাল শুধু 'চেক্' পেলাম। খুচ্‌রো গাড়ীভাড়ার খরচ কিন্তু কিছুই নেই। গোটা পাঁচেক টাকা তুমি দিতে পারো ?

টাকা ? কিন্তু, আচ্ছা—তা তুই বোস্ না ঘরে গিয়ে। দেখি যদি কোনোরকমে—মাসের শেষ কি না তাই—

বলতে বলতে সে অন্দরে না ঢুকে রাস্তায় গিয়ে নাম্‌লো।

ভিতরে এসে কিরণ বল্‌ল—বৌদি, এবার বিদায় নেবো।

ভামিনী আচ্ছন্নের মত মাথা তুলে তা'র দিকে তাকাল।

অনাথের এখন এদিকে আসার সম্ভাবনা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে কাছে সরে' গিয়ে কিরণ মৃদু মধুর হেসে বল্‌ল—কাল যে অনাথদা বলছিল, তোমায় আমি ভালবাসি, তা বুঝি বিশ্বাস করনি ?

শুধু মাত্র একটা কিছু জবাব দেবার জন্তেই ভামিনী তাচ্ছিল্য কণ্ঠে বল্‌ল—করেছি।

কিরণের গলা কেঁপে উঠ্‌লো। আর একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—সেটা কি করে, বুঝবো ?

রাগে তখন ভামিনীর সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপছে। বল্‌ল —কি করবো বল ভাই, বোঝাবার সম্বন্ধ ত নয়! তা হলেও না হয়—কিন্তু ত্যাখো ?—বলে' হঠাৎ একটু থেমে সে আবার বল্‌ল— কাল থেকে তোমাকে খুসি করবার জন্তে অনেক সহ্য করেছি। এবার ভাই তুমি যাও। ছেলে মানুষ, এত সব শিখ্‌লে কোত্থেকে ?

বলে' সে নিজেই একদিকে চলে' গেল।

অনাথ ফিরে এল। টাকা ধার পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের কাছে এসে বল্‌ল—তা হলে ত কিরণের যাওয়া হয় না দেখছি।

কেন ?—ভামিনী বল্‌ল।

গোটা পাঁচেক টাকা চায়। তাহলেই—কিন্তু আমার কাছে ত—

আচ্ছা, আমি দিচ্চি।—বলে' ভামিনী হন্ হন্ করে' গিয়ে ঘরে ঢুকে একটু পরে বেরিয়ে এসে অনাথের হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট গুঁজে দিল। বল্‌ল—দাও গে যাও। ও না গেলে আমি জল খাবো না!

কিন্তু এমন বিস্মিত অনাথ আর জীবনে হয়নি। একবার শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে একখণ্ড পাথরের মত গড়াতে গড়াতে সে কিরণের দিকে এগিয়ে গেল!

বিদায়টা আর জম্‌লো না; যেন স্বর কেটে গিয়েছিল।

প্রণাম করতে এলে ভামিনী বল্‌ল—না না থাক্, ছুঁতে হবে না। পায়ের ধূলো আমি কাউকেই দিইনে ভাই। এমনিই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার সুবুদ্ধি হোক্।

শুক্‌নো ক্লান্ত হাসি হেসে কিরণ বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় অবশ্য বল্‌ল—অনাথদা, চললাম। আস্‌চে মাসে এই পথে আর একবার বোধ হয় আসতে হবে। যদি আসি ত তোমার কাছেই দিন দুই—

অনাথ বল্‌ল—নিশ্চয়! তাহলে তোর বৌদিও খুব খুসি হবে!

ব্যাগটা হাতে নিয়ে শিষ দিতে দিতে কিরণ পথে নেমে চল্‌তে লাগ্‌ল।

গভীর

পরিচয় : একটি কিশোর ফেরিওয়ালার জীবনের একটিমাত্র রাত্রির ঘটনা। বিচিত্র আনন্দ ও বেদনার ভিতর দিয়ে সে রাত্রে সে যে সারাজীবনের গৌরব ও পাথেয় সঞ্চয় করেছিল— তারই কথা।

গয়া লাইনের একটা জংশন ষ্টেশনে একখানা ট্রেণ এসে থাম্‌ল। গাড়ীখানা আস্‌ছে পশ্চিম থেকে, যাবে কল্‌কাতায়!

গ্রীষ্মকালের গভীর কালো রাত্রি, ফুর্‌ ফুর্‌ ক'রে হাওয়া বইছে। অত রাত্রে ভিড় তেমন বিশেষ নেই। দু-একজন উঠ্‌ল, চার পাঁচজন মাত্র নাম্‌ল। গাড়ীর জান্‌লাগুলির কাছ দিয়ে একটা পানওয়ালা হেঁকে গেল, আর একজন এসে হাঁক্‌ল, 'পুরী-মিঠাই',—একটি ছেলে ঝুমঝুমি বাজিয়ে তার মণিহারি জিনিস-গুলির বিজ্ঞাপন ক'রে গেল, কিন্তু গাড়ীর ভিতরকার নিদ্রিত, অর্দ্ধজাগ্রত ও নিস্পৃহ যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই এল না।

বাঁশী বাজিয়ে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম্‌ ছেড়ে যখন ট্রেণখানি পার হয়ে বহুদূর চলে' গেল তখন আবার চারিদিকে নেমে এল রাত্রির নিঃশব্দ ছায়া। ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে আওয়াজ সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গভীরে ডুবিয়ে দিতে লাগ্‌ল, এবং প্ল্যাটফরমের উদাসীন প্রদীপগুলি তেমনি করেই অপলক চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে!

যে তিনটি যাত্রী এইমাত্র নাম্‌ল, তাদের সঙ্গে মালপত্র অতি সামান্যই। তিন জনের মধ্যে দুটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। পুরুষ দুটির মাথায় বড় বড় পাগ্‌ড়ি বাঁধা। পরণে তিনজনেরই ঢিলা পায়জামা। জাতিতে বোধ করি তারা শিখ। পায়জামা

ছাড়া মেয়েটির গায়ে একটি পাত্‌লা কাপড়ের পাঞ্জাবী, মাথায় একটি সবুজ রংয়ের ওড়না কাঁধের ওপর দিয়ে গা বেয়ে নীচে নেমে এসেছে, এবং তারই পাশ দিয়ে মেয়েটির মাথার বেণী ঝুলে পড়েছে একেবারে কটির নীচে। পায়জামাটিতে তার ধূলোবালি এবং ট্রেণের দাগলাগা। পায়ে একজোড়া কালো চটিজুতো। পুরুষ দুটির মধ্যে একটি ছোক্‌রা, আর-একটির কিছু বয়স হয়েছে। কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে তার বয়স সহজে ঠাহর কর্‌বার উপায় নেই।

ঝুমঝুমিওয়ালা তার মণিহারির ঝাঁপির দুই দিকের দুই আংটার সঙ্গে কাপড়ের দড়ি পাকিয়ে গলায় বেঁধে এতক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল। আজ বোধ হয় তার বিক্রি বেশী হয়নি, ঝুমঝুমিটা একবার বাজিয়ে সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ষ্টেশনের আলোয় তার সেই বিস্তৃত ঝাঁপির মধ্যে সৌখীন খেল্‌না ও মণিহারিগুলি ঝল্‌মল্‌ করছিল। আনন্দদীপ্ত দুটি চক্ষু নিয়ে মেয়েটি সেদিকে ফিরে দাঁড়াতেই বয়স্ক পুরুষটি চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল, এত্‌ রাত্‌মে ফেরি···যাও ভাগো···

ছেলেটি তার ঝাঁপি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে' পড়ল। তিনটি নরনারী জিনিসপত্রগুলি হাতে নিয়ে তারপর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে প্ল্যাটফরমের একান্তে একটি দ্বিতায় শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুম'-এ এসে প্রবেশ কর্‌ল।

ভিতরে আর কোনো প্রতীক্ষমান যাত্রী ছিল না। দুটো বেঞ্চি এবং ইজি-চেয়ারটা তারা এসে দখল করল। মালপত্রগুলি গুছিয়ে রাখ্‌ল মাঝখানের গোল টেবিলের ওপর। মেয়েটি অতি চঞ্চল। ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে, চেয়ার ও বেঞ্চির চারিদিকে পায়চারি করে', বড় আয়নাটায় মুখ দেখে, সঙ্গের যুবটিকে বয়স্ক লোকটির অলক্ষ্যে একটি ঠোনা মেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এই মৃতকল্প পরিত্যক্ত ঘরখানিকে জীবনের মুখরতায়, উল্লাসে, দীপ্তিতে, গৌরবে একেবারে রোমাঞ্চিত ক'রে তুল্‌ল। দীর্ঘ পথ গাড়ীর মধ্যে অতিক্রম ক'রে এসে সে যেন মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে।

যুবকটি তন্দ্রায় কাতর হয়ে পড়েছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সে আস্তে আস্তে একটা বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বয়স্ক লোকটি স্নেহের হাসি হেসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সুন্দর পাঞ্জাবী ভাষায় বল্‌ল,—সমস্ত প[illegible]। তুমি ঘুমিয়েছ, আর আমরা জেগে বসেছিলাম! এবার ঘুম পাচ্ছে, বিরক্ত করো না কিন্তু, চুপটি ক'রে ব'সে' থাক লক্ষ্মীটি, গাড়ী আসতে এখন অনেক দেরী!

মেয়েটি ইজি-চেয়ারে বসে' পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। হাসি তার সব-কিছুতেই। ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েও তার হাসি থামে না।

কতক্ষণ কেটে গেছে। যুবকটির নাক-ডাকার বিচিত্র শব্দ শুনে মেয়েটি সকৌতুকে তার দিকে এক-একবার তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার চঞ্চল দুটি চোখের তারা স্থির হয়ে গেল 'স্প্রীংয়ের' দরজাটার দিকে তাকিয়ে। সোজা হয়ে সে উঠে বস্‌ল। মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌ল, 'চাচা' তন্দ্রায় কাৎ হয়ে পড়েছেন। পাছে শব্দ পেয়ে তিনি জেগে ওঠেন এজন্য চটিজুতোটি সে আস্তে আস্তে ছাড়ল, তারপর পা টিপে টিপে উঠে সে দরজার কাছে এল।

দরজার দুটি পাল্লার ঠিক নীচেই বাইরে সেই মণিহারির ঝাঁপিটা নামিয়ে ঝুম্‌ঝুমিওয়ালা তার পাশে বসেছে। এতবড় লোভ আর সে সংবরণ কর্‌তে পারল না, একটুখানি সে হাস্‌ল, তারপর মাটিতে হেঁট হয়ে পড়ে' দরজার নীচে দিয়ে একটি হাত গলিয়ে চুপি চুপি টপ্‌ করে' একটি কাঁচের পুতুল তুলে হাত সরিয়ে নিল। ঝুম্‌ঝুমিওয়ালা কোনো সাড়াই দিল না।

মেয়েটির কিন্তু আগে তা মনে হয়নি। সে ভেবেছিল এ চুরি তার হাতে হাতে নিশ্চয় ধরা পড়বে, তারপর খানিকক্ষণ হবে কাড়াকাড়ি, এবং ঠিক তারপরেই জোর করে' হাতটা ছিনিয়ে সে পালিয়ে আস্‌বে। ছেলেটি চেঁচামেচি করে' ঘরে এসে ঢুকবে, সে তখন বল্‌বে, ইস্‌ তুমি কি আমাকে নিতে দেখেছ ? আমি ত ছিলাম দরজার এদিকে! কে হাত বাড়িয়েছিল তা আমি কি জানি ?—ছেলেটিকে কাঁদো কাঁদো হতে দেখ্‌লে তবে সে

পুতুলটা ফিরিয়ে দেবে। সমবয়সী ছেলেকে জব্দ করতে তার ভারি ভাল লাগে।

মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেল। চাচার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার একটা পাল্লা টেনে বাইরে সে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ল, দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে অকাতরে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝাঁপিশুদ্ধ চুরি গেলেও তার সে ঘুম হয়ত ভাঙ্‌ত না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের একটি করুণ ক্লান্তির ছায়া তার নিদ্রিত মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

এ অবস্থায় কেউ যে এমন ক'রে ঘুমুতে পারে মেয়েটির তা ধারণায় এল না। হেঁট হয়ে সে তার স্বাভাবিক অপরূপ কোমল কণ্ঠে ডাক্‌ল, 'ইয়ারা' ?

ফেরিওয়ালা জেগে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বস্‌তে সে বল্‌ল,—তোমার জিনিস যদি চুরি হয়ে যেত' এক্ষুণি ?

ছেলেটি তার মাতৃভাষায় বল্‌ল, চুরি ? এঃ মাথা ভেঙে দেব না ?

তারপরই সে একটা রবারের পাখী তুল্‌ে' তার পেট টিপে বাঁশী বাজিয়ে বল্‌ল, লেও, ছে প্যায়সা।

মেয়েটি একটু হেসে পায়জামাটা গুটিয়ে ঝাঁপির কাছে উবু হয়ে বসে' বল্‌ল—তোমার সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে ? দেখ দেখি ?

ছেলেটি একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বল্লে,—তুমি নাও না কি চাও,... এই নাও 'মণি ব্যাগ'—দো আনা !

—ও আমার চাইনে।

—আচ্ছা, এই নাও জর্দার কৌটো—এক আনা। জরির ফিতা নেবে ? সাত আনা গজ ! তবে এই লাট্টু আছে, লাট্টু, দো দো প্যায়সা !

—লাট্টু আমার কি হবে,—মেয়ে মানুষ !

—তোবে কি লেবে ? 'সিসা' চাই ? মুখ দেখবার জন্যে ? তোমার মুখ সুন্দোর আছে !

মেয়েটি তার বল্বার ভঙ্গী দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্ল। বল্ল,—চাইনে—তুমি দেখো তোমার মুখ, দুষ্টু !

নতুন 'লাইসেন্স্' পেয়ে ছেলেটি প্রথম কারবার সুরু করেছে, ক্রেতা চেন্বার অভিজ্ঞতা এখনও তার ভাল ক'রে হয়নি। সে বল্ল, তবে ত' হায়রাণি, তোমার কাছে কত পয়সা আছে বল, সেই মত জিনিস বেছে দিচ্ছি।

পয়সা ? পয়সা আমি পাব কোথায় ?

ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর শ্লেষের হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্ল, যাও গিয়ে ঘুমোওগে। মিছামিছি এতক্ষণ—

মেয়েটি নড়্ল না, নানা রকমের চক্চকে ঝল্মলে খেল্না

এবং নানা সৌখীন জিনিসের মধ্যে তার দৃষ্টি গিয়েছিল হারিয়ে। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁচের পুতুলটি সে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল। হয়ত ভাবছিল, চুরির জিনিস ফিরিয়ে দেবার লজ্জা সে কেমন ক'রে সাম্‌লাবে!

ছেলেটি আবার মুখ ফিরোল। এত বড় অবজ্ঞা সয়েও যে এমন ক'রে ব'সে থাকতে পারে তার প্রতি কেমন যেন একটু মায়া হ'ল। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। একজনের কাছে এই বিশাল পৃথিবী শুধুই রূপকের কল্পলোক, আনন্দের মোহমন্দির, স্বপনের অমরাবতী; আর একজন ধূলিকণ্টকাকীর্ণ রূঢ় বাস্তবের পথচারী, জীবন-সংগ্রামের অসহায় পদাতিক,—এ পৃথিবী তার কাছে অপরিসীম দুঃখের, অসহনীয় অভিজ্ঞতার, অনন্ত বেদনার!

দুজনে প্রায় পাশাপাশি বস্‌ল। একটি নদী যেন এক বিস্তৃত মরুভূমির প্রান্ত সীমায় এসে থেমেছে। তার সেই সুন্দর চোখের ভিতর তাকিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—নাম কি?

—নাম? শুন্‌বে? শেয়ান্তি দেবী। তোমার নাম?

ছেলেটি সেই নির্জ্জন ষ্টেশন আর অন্ধকার রেল-পথের দিকে ার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঈষৎ হেসে বল্‌ল—কি হবে আমার নাম বলে তোমার ত' মনে থাক্‌বে না!

রয়ান্তি বল্‌ল,—আমার নাম তবে জেনে নিলে কেন? বল গর!

ছেলেটি এড়িয়ে গেল। নাম ব'লে এই নিভৃত আলাপের যবনিকা সে টানতে চাইল না। বল্‌ল,—তুমি কিছু কিন্‌লে না, আমার কেমন ক'রে চলে বল ত ? আজ সারাদিনে বল্‌তে গেলে কিছুই···তোমার মুলুক কোথায় ?

শান্তি বল্‌ল—পান্‌জাব ; অমিয়্‌তসর্‌ ।

—এদিকে এলে যে ?

শান্তি এবার মুখ রাঙা ক'রে মাথা হেঁট করল। যে-প্রশ্নটা ছেলেটি উত্থাপন ক'রে বস্‌ল, সে-প্রশ্ন যেন কোনো নিকটাত্মীয়ের। ছোট মেয়ে, ইতিমধ্যে ভুলেই গেছে ছেলেটি পথের একটি সামান্ত ফেরিওয়ালা, পূর্ব্ব-পরিচয় তার সঙ্গে একবিন্দুও নেই !

—চুপ ক'রে রইলে যে ?

শান্তি বলল—আমি এই প্রথম এলাম এ মুলুকে চাচার সঙ্গে। —আর ওই ছেলেটা, ওই যে গাঁ-গাঁ ক'রে নাক ডাক্‌ছে—ও-ও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।—বলে' সে দরজার ভিতর দিয়ে নিদ্রিত যুবকটিকে দেখাল।

—ও কে তোমার ?···আবার যে চুপ করলে ? বলবে না ?

শান্তি শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল, যুবকটির সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কাকা ওই ছেলেটার চাক্‌রী দিয়ে সংসার পেতে দেবার জন্ত নিয়ে যাচ্ছেন কালীমাটীতে। চাচা তার টাটা-কোম্পানীর বড় চাকুরে কি-না !

ছেলেটি তার জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করল, তারপর একটি ছোট্ট অলক্ষ্য নিশ্বাস ফেলে বল্ল, এবার আমাকে যেতে হবে, ও-লাইনে গাড়ী আস্‌বে এখুনি। আর শোন, নাম জানতে চাইছিলে না তখন? আমার নাম বদ্‌রি।

এ কথা ক'টি ব'লে সে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতেই শান্তি বল্ল, এত রাতে কেউ তোমার জিনিস কিন্‌বে না। আমিই-বা এখানে একলা ব'সে ব'সে কি করব?

এ একেবারে অদ্ভুত প্রশ্ন! সামান্য আধঘণ্টার পরিচয়ে এত বড় দাবি যে খাটানো যেতে পারে একথা বদ্‌রির জানা ছিল না। তার মনে হ'ল, শান্তি ত কম স্বার্থপর নয়! খেয়ালের খেলার মত তাকে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে গাড়ী এলেই ত সে স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে যাবে! তার জন্য শুধু রেখে যাবে নির্জ্জনে উদাসীন ষ্টেশন, ক্রেতার জন্য ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি, এবং একটি নিঃ[illegible]! আর একদিনের কি একটা গল্প তার মনে পড়্‌ল। না, এ হ'তেই পারে না! ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে সে বল্ল,—তুমি যাও ভাই তোমার চাচার কাছে।

—যাব না, কি করবে তুমি? এই আমি বসে' রইলাম।—বলে' শান্তি খেল্‌নার ঝাঁপির একটা কানা হাতে চেপে বসে' রইল।

বদ্‌রি বল্ল, আমার লোস্‌কান দেবে কে?

শান্তি বল্‌ল—তোমার জিনিস, তুমিই দেবে ?

বদ্‌রি আবার তাকাল তার মুখের দিকে। বিদেশিনীর দুটি দীর্ঘায়ত গভীর কালো চোখে এক নির্লিপ্ত চাহনি। মাথার বেণীটি তার ঝুলে পড়েছে কোলের মধ্যে। নধর সুপুষ্ট হাতখানিতে একগাছি চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি, ক'ড়ে আঙ্গুলে একটি ছোট্ট আংটি, পা দুখানি ধুলো-বালি মেখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। শীতপ্রধান দেশের মেয়ে ব'লে মুখখানিতে রক্তের আভা স্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছিল। বহু যাত্রীগাড়ীতে বদ্‌রি বহু সুন্দরী মেয়েকেই দেখেছে, "কিন্তু এত কাছাকাছি এমন রূপবতী নারী আর কোনোদিন তার চোখে পড়েনি। এই কিশোরীটির হাত ছাড়িয়ে চলে' যাবার মানসিক দৃঢ়তা সে হারিয়ে ফেলেছিল।

বদ্‌রি অনেকক্ষণ তার চোখের ভিতর তাকিয়ে বল্‌ল,—আমি তোমাকে চিনি !

—দূর, কোনোদিন দেখেছ না-কি যে চিন্‌বে ?

অভিভূত হয়ে বদ্‌রি বল্‌ল,—হ্যাঁ চিনি, নিশ্চয় চিনি, আমি তোমাকে দেখেছি এর আগে।

—কোথায় দেখেছিলে ?

ঘাড় ফিরিয়ে বদ্‌রি একবার রেল-পথের দিকে তাকালো। কোথায় দেখেছে তা সে কেমন করে' বল্‌বে ? স্মরণের পরপার পর্য্যন্ত সে একবার হাতড়ে দেখ্‌ল। সসাগরা ধরিত্রী আর নক্ষত্র-

খচিত অনন্ত আকাশ সে মনে মনে তোলপাড় ক'রে এল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌ল, হুঁ, ঠিক আমি চিনি তোমাকে—দেখেছি যে আগে।

তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে শান্তি হাস্‌ল। হেসে বল্‌ল,—তাহলে এ জন্মে নয়!

দুজনে বসে গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। শান্তি বল্‌ল, তাদের বাড়ি অমৃতসরে 'জালিয়ান-বাগের' কাছেই, আর একটু গেলেই 'ঘণ্টাঘর'—ওই যেখানে রয়েছে সরোবরের মাঝখানে 'সোনেকা মন্দির'। পিতা তার রেশমের কারবার করেন। একবার কবে সে লাহোরে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখে এসেছিল!—বদ্রি বল্‌ল,—তাদের বাড়ি এই কাছেই গোয়ালা মহল্লায়। বাপ তার দুধ বিক্রী করে। তার মামা হচ্ছে 'ধরমশালা'র দারোয়ান। একবার ঝড়ে তাদের বাড়ি পড়ে' গিয়েছিল। মা তার পাগ্‌লি। চম্পা নদীতে তারা প্রায়ই মাছ ধরতে যায়।

একজন থামে আর একজন বলে, এমনি করেই তাদের আত্ম-কাহিনী গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ল। যে বন্ধু নতুন এসে জোটে সে আনে নতুন বিস্ময়! তার হৃদয়টিকে আবিষ্কার করবার জন্য সমস্ত মনের কৌতূহলের আর সীমা থাকে না! মুখোমুখী দু'জনে বসে' নিজ নিজ অন্তরের কপাট খুলে পরস্পরকে অভিনন্দিত কর্‌ল। পথচারী ও গৃহবধূর মাঝামাঝি কোনো পার্থক্যই আর

রইল না। সমবয়সের নিঃসঙ্কোচ আলাপের ভিতর দিয়ে এমনি করেই তাদের হ'ল গভীর পরিচয়, প্রীতি সখ্যতা এবং ভাবের আদান-প্রদান।

হঠাৎ তাদের আলাপে বাধা পড়ল একটি কুকুরের প্রাণপণ করুণ চীৎকারে। বেচারা বোধ হয় আহার সংগ্রহ করতে নেমেছিল লাইনের ধারে, একখানা চলন্ত মালগাড়ীর চাকায় লেগে গেল ধাক্কা। কুকুরটা চীৎকার করতে করতে একদিকের প্লাটফরমে যখন উঠে এল, শান্তি দেখল, একটি পা উঁচু ক'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিকৃত আর্ত্তনাদ করতে করতে পালাচ্ছে, ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ছে তার সেই পা খানি বেয়ে।

ভয়ে উত্তেজনায় বিবর্ণ আহত মুখে সে বদ্‌রির দিকে তাকাল। সর্ব্বাঙ্গ তখন তার থর থর ক'রে কাঁপছে। কিন্তু এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেও মাল গাড়ীর গতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল না, আগের মতই মন্থরগতিতে নিজের পথে চল্‌তে লাগল।

বদ্‌রি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল। বল্‌ল, এ ত' দুবেলা হচ্ছে। কত কুকুর এমনি···সেদিন একটা কুলী মোট্ নিয়ে পার হবার সময়—বাস্, দেখতে দেখতেই একটি পা তার আট্‌কে গেল চাকার তলায়।

শান্তি সাড়া দিল না। দূরে কোথায় গিয়ে থেকে থেকে কুকুরটা তখনও আর্ত্তনাদ করছিল, সেইদিকে সে তাকিয়ে

রহিল। মনে হ'ল, নিষ্ঠুর পৃথিবী! একটি অসহায় প্রাণী চিরজীবনের জন্ত যে পঙ্গু হয়ে গেল, কেউ একবার সেদিকে ফিরেও তাকাল না! যে প্রতিবাদ করতে পারে না, যার বেদনার কোনো ভাষা নেই; তার জীবন কি এত তাচ্ছিল্যের, এতখানি অনাদরের?

অশ্রুতে শান্তির চোখ দুটি পরিপূর্ণ হয়ে এল। এ শাস্তি যেন তাকেই সইল, এ আঘাত যেন তারই বুকে বাজল। পরের ব্যথা যে বুঝতে পারে সে চিরদিনই দুঃখ পায়। শান্তি জীবনে সুখী হতে পারবে না!

বদ্‌রি বল্‌ল—আরও আছে, তুমি ত জানো না, কীই বা দেখেছ। আমরা ওদিকে আর ফিরেও তাকাইনে!

ওড়না দিয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বস্‌তেই বদ্‌রি তাকে বোঝাতে লাগল, এ দুনিয়ার কত দিকে কত করুণ দৃশ্যই প্রতিদিন দেখা যায়। এর চেয়ে তারা আরও নিষ্ঠুর, আরও ভীষণ, আরও মর্ম্মান্তিক!—বদ্‌রি হেসে বল্‌ল, তোমার মতন দুর্ব্বল হ'লে দুনিয়ায় আমাদের ঠাঁই হ'ত না।

বদ্‌রি বোধ হয় আপন বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী আরও কিছু বক্তৃতা দেবার চেষ্টা কচ্ছিল, সহসা চাচাকে শান্তির পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

চাচা শান্তির হাত ধ'রে তুলে বল্‌লেন, এবার গাড়ী আসছে!

'কাপ্‌ড়া বদল্‌ কর্‌ লেও জল্‌দি। সোহন সিংকো উঠায় দেও।'

শান্তি গিয়ে নিদ্রিত সোহন সিংকে একটা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে কাপড়চোপড় নিয়ে গোসলখানায় ঢুক্‌ল। সে যে কেঁদে ফেলেছে এ জন্যে তার লজ্জার আর সীমা রইল না। ছেলেটা নিশ্চয়ই তাকে হেনস্তা করবে!

চাচা বল্‌লেন, আবার বুঝি জিনিস বিক্রী করতে এসেছিলি আমার মেয়ের কাছে? বদ্‌মাস্‌!

বদ্‌রি বল্‌ল, গরীব আদ্‌মী সর্দ্দারজী, এমনি করেই ত আমার রোজগার!—এই বলে' সে তার ঝাঁপি নিয়ে উঠে কিয়দ্দূর চলে' গেল। চাচা যেন তাকে মনে করিয়ে দিলেন, শান্তির সঙ্গে তার অবস্থার কী তফাৎ, কতখানি সে কৃপার পাত্র!

জিনিসপত্র হাতে নিয়ে সবাই যখন আবার প্লাট্‌ফরমের ওপর বেরিয়ে এল, রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। দূর থেকে শান্তিকে দেখে বদ্‌রি অবাক্‌ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে পরিচ্ছদ বদল করেছে। পরণে তার বেগুনী মখ্‌মলের ওপর সোনালী জরির বিচিত্র কাজ-করা পায়জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় এবার নীল রংয়ের ওড়না, পায়ে জরির জুতো। শান্তি একবার চারিদিকে তাকালো। বদ্‌রির দিকে তার দৃষ্টি পড়্‌ল না। কেনই-বা পড়বে! ব্যবধান যে তার সঙ্গে অনেকখানি!

বদ্‌রি ভাবলো, এই মহীয়সীর সঙ্গে একটু আগে তার অনধিকার ঘনিষ্ঠতার কি কোনো যুক্তি আছে? অখ্যাত নগণ্য তার জীবনে শান্তি শুধু ভিক্ষার মত দিয়ে গেল সামান্ত বন্ধুত্বের যৎসামান্ত গৌরব, যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য! তুচ্ছতার ক্ষুদ্রতার লজ্জা ওই মেয়েটি যে তার গায়ে লেপে দিল, এ সে লুকোবে কেমন ক’রে? বদ্‌রি কাঙাল, কিন্তু নিজের স্পর্দ্ধাকে সে মার্জ্জনা করতে পারল না। রাজকন্তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাল বালকের? এ যে মিথ্যা, এ যে অসম্ভব, এ গল্প কেউ যে বিশ্বাস করতে চাইবে না!

কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে ধীরে ধীরে সে ওদিকে চলে’ গেল। ছোট লাইনে গাড়ীটা এখুনি ছাড়বে। বদ্‌রি ঘুরতেই লাগ্‌ল, যাত্রীদের কাছে মিনতি জানিয়ে তার খেল্‌না ও মণিহারী বিক্রি করবার আর রুচি ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে তার চোখের সুমুখ দিয়েই গাড়ীখানা ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে’ গেল।

এক জায়গায় সে এসে বস্‌ল। মুখের ভাষা তার যেন ফুরিয়ে গেছে! তার কোনো উৎসাহ নেই, সে ক্লান্ত! এই কদর্য্য ফেরিওয়ালাগিরি বেশীদিন সে হয়ত আর করতে পারবে না। বদ্‌রির মনে হ’ল, এইখানে কিছুক্ষণ শুয়ে চোখ বুজ্‌তে পারলে সে যেন বাঁচে।

ওদিকের লাইনে ততক্ষণে ডাকগাড়ী এসে গেছে।

তিন মিনিট মাত্র দাঁড়াবে। ওঠো বদ্রি, সময় নেই! তোমার এই অকারণ অবসাদের মূল্য কি! কে বুঝ্‌বে এক পলকে কা'র জীবন কখন ব্যর্থ হয়ে গেল! তোমার গোয়ালা-পিতার নির্দ্দয় শাসনকে স্মরণ করে' উঠে দাঁড়াও! কে বলেছে তুমি ক্লান্ত?

বদ্রি ঝাঁপি নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ছুট্‌ল।

কাঠের সাঁকো বেয়ে দ্রুতবেগে সে নেমে আস্‌ছিল, যাঃ—গেল তার ঝাঁপি একেবারে কাৎ হয়ে। ছড়্‌ ছড়্‌ ক'রে তার মণিহারীগুলি সিঁড়ির ওপরেই ছড়িয়ে পড়্‌ল। পিছন থেকে যারা আস্‌ছিল তারা কেউ গেল সেগুলি মাড়িয়ে, পা দিয়ে কেউ দিলে ঠিক্‌রে, কেউ দিল গালি, কেউ বলে' গেল, আহা!

একে একে সেগুলি কুড়িয়ে সে যখন সবগুলি একত্র কর্‌ল তখন ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। কাছিটি গলার সঙ্গে ভাল ক'রে জড়িয়ে সে আবার নীচে নেমে এল। গাড়ীর কাছে আসতেই একজন তাকে দাঁড় করিয়ে এক প্যাকেট্‌ সিগারেট্‌ কিন্‌ল। তারপর নিল একটা দেশালাই।

—পয়সা দাও জল্‌দি বাঙালী বাবু?

আরে দাঁড়া বেটা, একদম লাটসায়েব।—ব'লে বাবুটি প্যাকেট্‌ খুলে সযত্নে একটি সিগারেট বা'র ক'রে দেশালাই জ্বেলে ধরিয়ে বললেন, কত?

—তেরো পয়সা!

—ভাগ্, সবাই দেয় এগারো পয়সা আর তুই···সবসুদ্ধ তিন আনা দেবো।

—বেশ তাই দাও।

বাবুটি একটি টাকা বা'র করলেন। বোধ হয় টাকাটি ভাঙাবার উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল। বদ্রিকে আবার বগ্লি বা'র ক'রে টাকার ভাঙানি গুণে গুণে দিতে হ'ল। একটা সিকি অচল ব'লে বাবুটি আবার সেটি বদ্লে চারিটি একআনি নিলেন।

আবার কয়েক পা এগোতেই আর একটা লোক তাকে বাধা দিয়ে বলল, এনামেলের চাম্চে কত ক'রে ?

শান্তি যে তাকে ও-গাড়ী থেকে হাতছানি দিয়ে ডাক্ছে বদ্রির তা দৃষ্টি এড়ায়নি। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিশ্বাস রোধ ক'রে সে বল্ল, দু-আনা, নেবেন ?

—বেশ ট্যাক্সই হবে ত ? ছ' পয়সা পাবি।

তখন বাঁশী বেজেছে। বাবুটির কাছে চাম্চেখানি রেখেই সে দৌড়লো শান্তির দিকে, পয়সা নেবার আর সময় হ'ল না। গাড়ী তখন খুলে দিয়েছে !

কিন্তু শান্তির কাছে পৌছল সে অনেক দেরীতে। আর কিই-বা তার বল্বার ছিল! কাছাকাছি পৌছতেই বিব্রত এবং বিপন্ন হয়ে শান্তি হাত বাড়িয়ে কাঁচের পুতুলটি তার ঝাঁপির মধ্যে ফেলে দিল। তারপর হেসে বল্ল, চুরি করেছিলাম !

ঝাঁপিটা পথের ওপরেই নামিয়ে কি জানি কেন বদ্রি ছুটতে লাগল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে—নিতান্ত শিশুর মত, অর্ব্বাচীনের মত। শান্তি গলা বাড়িয়ে বল্ল—কোথা ছিলে এতক্ষণ···আহা হা, পড়ে' যাবে, থামো থামো···পাগলের মতন···

গাড়ী তখন ছুটছে। বিদেশিনী মেয়েটি জান্লা দিয়ে আধখানি দেহ বাড়িয়ে হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকে জানালো বিদায়-অভিবাদন! মাঝখানের ব্যবধান ততক্ষণে দীর্ঘ হয়ে গেছে!

ফিরে এসে বদ্রি পুতুলটির দিকে একবার তাকাল। শান্তির হাতের ঘামে সেটি তখনও আর্দ্র ও উষ্ণ। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল, এটি আর সে বিক্রী করবে না, তার পাতার ঘরের বাঁকারির বাঁধুনির মধ্যে গুঁজে রেখে দেবে। কেউ যেন জান্তে না পারে এ পুতুলটি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার চিহ্ন!

গাড়ীটা যে-পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেইদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সে একবার তাকাল। কিছুই দেখা গেল না; কেবল সেই পথের দুধারে বাব্লার ঘন জঙ্গলের সীমানায় ভোরের আকাশ একটু একটু ক'রে রাঙা হয়ে উঠছিল।

নূতন দিবসের ফিরি করবার জন্য বদ্রি ঝুম্‌ঝুমিটি তুলে নিয়ে একবার বাজাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেবল হাতই তার কাঁপ্‌ল, ঝুম্‌ঝুমিটি আর বাজ্‌ল না।

প্রসাধন

পরিচয় ঃ একটি বিগত-যৌবন ও আলোকপ্রাপ্তা ভদ্রমহিলার অঙ্গ-সজ্জা এবং মনোবৃত্তি—এই গল্পের কথা

শপদ্ম

বালীগঞ্জ এভেন্যুর ধারে একখানি ট্রাম্‌গাড়ী এসে দাঁড়াল। রাত তখনও আটটা বাজেনি।

অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে ছাতিটি বাঁ-হাতে চেপে ডান্‌ হাতে হাতল্‌টি ধ'রে একটি একাকিনী মহিলা গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ীখানি আবার ছেড়ে দিল।

বিস্তৃত দীর্ঘ পথ তখন প্রায় জনবিরল, ক্বচিৎ এক একখানি মোটর দ্রুতগতিতে এদিকে ওদিকে পার হয়ে চলেছে। মহিলাটি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি আর একটা চওড়া গলির মধ্যে ঢুক্‌লেন। কিয়দ্দূর গিয়ে তিনি একবার থম্‌কে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে একবার হেঁট হয়ে দূরের সরকারি গ্যাসের আলোতে নিজের দিকে তাকালেন, তারপর আঁচলের তলায় হাত গলিয়ে ট্যাঁকের ভিতর থেকে একটি ময়লা রুমাল বে'র ক'রে তাড়াতাড়ি পায়ের জুতো জোড়াটি মুছে নিলেন, পরে ব্লাউসের ভিতর থেকে আর একখানি রুমাল বে'র ক'রে অতি মৃদুভাবে থুপে থুপে মুখের উপর বুলিয়ে নিলেন, বাঁ-হাতে ঝোলানো 'স্যাচেল্‌'টি খুলে ভিতরের দিকে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে কি যেন একবার নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখলেন, তারপরে আবার যেন নিজেকে দৃঢ় এবং সহজ করবার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

পল্লীটি অভিজাতগণের। অদূরে একটি প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকায় আজ প্রীতি-ভোজের উৎসব।

উৎসবটি সম্ভবত একটি বিবাহকে উপলক্ষ্য ক'রে। প্রথম ঢুকতেই ফটকের মাথায় অত্যুজ্জ্বল আলো; তারপর দু'দিকে বাগান—বাগানের গাছগুলি বিদ্যুৎ-দীপালোকে সুদৃশ্য করা হয়েছে। সুমুখে একটা ঊর্দ্ধস্রোতা ফোয়ারা। প্রাসাদের চারিদিকের সমস্ত কার্ণিশ ও বারান্দাগুলি লাল এবং সবুজ রংয়ের বিচিত্র আলোকমালা ও লতা পাতা ফুল এবং ঝালরে অলঙ্কৃত হ'য়ে পথিকজনের দৃষ্টিতে গৃহস্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য জম্ জম্ করছিল।

ফটকের মাথার উপর মাচা তৈরী ক'রে শানাই বসেছে। আজ দু'দিন ধ'রে তাদের বাজনার আর বিরাম ছিল না। নীচে দিয়ে অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণের অবারিত যাতায়াত ত চলছেই।

পথের অদূরে সরু গলির বাঁকে আলো বাঁচিয়ে মহিলাটি অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত লক্ষ্য করলেন। একটি আড়ষ্ট সঙ্কোচ কেমন যেন তাঁকে পা বাড়াতে বাধা দিচ্ছিল। প্রীতি-ভোজের এতখানি আড়ম্বর হবে এ হয়তো তাঁর জানা ছিল না, কিম্বা এমনো হতে পারে এখানে আসাটা তাঁর অনিচ্ছাকৃত। অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এবং অনেকখানি ইতস্ততঃ ক'রে প্রায় মিনিট কুড়ি পরে তিনি হঠাৎ এক সময়ে তাড়াতাড়ি এসে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি এমনিই

হাঁপাচ্ছিলেন যে, মনে হ'ল, এই প্রাথমিক সমস্যাটি কাটাতে তাঁকে অনেকটা পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এদিক ওদিক তাকাবার আর সময় ছিল না, কেউ হঠাৎ দেখতে পেয়ে কোনো প্রশ্ন ক'রে ফেল্‌তে পারে। কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে তিনি অন্দরের দিকে গেলেন। চারিদিক থেকে আলো এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি মুখের ভিতর থেকে একটি বিনীত হাসি টেনে মুখখানিকে সুদৃশ্য ক'রে নিলেন। তাঁর গতিভঙ্গী দেখলে মনে হবে এখানে আসা এই তাঁর প্রথম নয়। প্রসাধন-পারিপাট্যে তিনি এখানকার যে কোনো তরুণীর সমকক্ষ হ'তে পারেন।

দোতলায় উঠে ডান্‌-হাতি একটি হল্‌-ঘরে মহিলা-মজলিশ বসেছিল। ভিতরটা মেয়েতে একেবারে ঠাসাঠাসি। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে মেয়েগুলিকে চয়ন ক'রে আনা হয়েছে। সমস্ত কক্ষটির প্রদীপ্ত এবং উগ্র আলোকের নীচে তাদের বিশৃঙ্খল এবং অসংলগ্ন হাসিতে, কলকণ্ঠে, কোলাহলে ও সঙ্গীতের অপব্যবহারে বিরাট অট্টালিকাটির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হ'য়ে উঠছিল। মজলিশটি যেমন ছন্দহীন, তেমনি রাশ-আল্‌গা।

উল্লিখিত মহিলাটি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। নবাগতার আপাদমস্তক দেহের দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষণেকের জন্য মেয়েরা একবারটি স্তব্ধ হ'য়ে গেল, কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই

নিতান্ত উপেক্ষায় তারা আবার আগেকার অসংযত গণ্ডগোলের সূত্র ধ'রে আপন আপন রুচিতে এগিয়ে চল্‌লো।

ভিতর থেকে একটি মেয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল, 'আসুন ছোটমাসিমা, অনেকদিন পরে—'

ছোটমাসিমা হেসে তার উত্তর দিয়ে বললেন,—ভাল ত সব?

প্রশ্নটি যে অত্যন্ত মৌখিক ভদ্রতার, তা তিনি নিজেই বুঝলেন। জুতোটি ছেড়ে ছাতাটি হাতে নিয়ে তিনি টেবিল-ল্যাম্পটির কাছ ঘেঁষে সেই তরুণীটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনেকে বসেছে কৌচে, কুশন্‌-চেয়ারে, কিম্বা টেবিলের ধারে হেলান দিয়ে —কিন্তু তিনি বসলেন আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর। এটি তাঁর বিনয়। তাঁর ভদ্র এবং সুষ্ঠু হবার চেষ্টাটা সর্ব্বজনবিদিত। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারেই তাঁর যাতায়াত আছে।

মজলিশের মধ্যে প্রথম যার সঙ্গে আলাপ হয় তার সঙ্গেই হয় ঘনিষ্ঠতা। সেই মেয়েটির সঙ্গে তিনি চুপি চুপি কথা সুরু করলেন।

—সুনীতি, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। আচ্ছা, তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে সেই মানহানির মাম্‌লাটা এখনো চল্‌ছে?

প্রশ্নটি বিশ্রী, এর মধ্যে সুনীতির কোথায় যেন একটি গোপন লজ্জা ছিল। সে তার রক্তাভ মুখখানি হেঁট ক'রে শুধু বল্‌ল, না, ক্ষতিপূরণ দিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

কথাটা ব'লেই তার আর এখানে বসবার প্রবৃত্তি হইল না, উঠে যেতে পারলে সে তখন বাঁচে। মানুষের লজ্জাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা ছোটমাসির চিরদিনের অভ্যাস। বয়স তাঁর চল্লিশ কবে ডিঙিয়ে গেছে, কিন্তু ঠিক যে কত তা তিনিও হিসাব করেন না, অন্যেও জানে না। তাঁকে দেখে প্রথমেই মনে হবে শারীরিক গঠন তাঁর একটুও আল্‌গা হয়নি, এটি নাকি তাঁর প্রসাধনের কৌশল, এমন কি পিছন থেকে দেখলে তাঁকে ঈষৎ স্থূল ব'লেও মনে হতে পারে; কিন্তু যে তাঁকে জানে, একই বাড়ীতে যে তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, সেই বলবে, তাঁর রূপ নেই, দেহখানি তাঁর কদাকার কঙ্কাল, জরা এসে তাঁর সর্ব্বাঙ্গের ডালপালাগুলিকে শ্রীহীন ও রসহীন ক'রে ফেলেছে।

আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই ষোল, পঁচিশ এবং বড় জোর তিরিশ বছরের মধ্যে। যাঁরা বয়স্কা, প্রবীণা—তাঁদের বৈঠক বসেছিল পাশের ঘরে। ছোটমাসিমা সে ঘরে যাননি, তার কারণ বার্দ্ধক্যকে তিনি অতিরিক্ত অপছন্দ করেন। যে নদী বহুদূর পথ অতিক্রম ক'রে এসে শুকিয়ে যাচ্ছে তার জল তিনি স্পর্শও করেন না।

সুনীতির একখানি হাত টেনে নিয়ে তিনি বললেন, কতদিন তোমাদের নিয়ে এক সঙ্গে থেকেছি আজ ভাবলেও আনন্দ হয়। সত্যি, তোমাদের ছেড়ে আমার চলেও না,—তা ছাড়া তুমি ত

জানো সুনীতি, সবাই আমাকে কত ভালবাসে! সবাই কত আদর করে আমাকে বল ত?

সুনীতি জানে তিনি শ্রদ্ধা চান্ না, কারণ অন্যের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি-তাঁর বয়সটাকে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করে। কেউ যদি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না ক'রে কোলাকুলি করে তা'তে তিনি বেশী আনন্দ পান্। তিনি চান্ আদর, ভালবাসা, স্নেহ—তিনি চান্ তাঁকে নিয়ে অল্পস্বল্প মেয়েলি হাস্য-কৌতুক।—ব্যঙ্গ নয়, রসালাপ।

কোলাহল এবং কালকাকলীর মধ্যে এক সময় এল সরবৎ, পান, গোলাপজল ও একরাশি তাজা ফুল। সবাই সবাইকে ভাগ বাটোয়ারা ক'রে দিল, এদিকে তার কিছুই এল না। একটি মেয়ে ওধার থেকে এতক্ষণ ছোটমাসিমাকে তাগ করছিল, এইবার গোলমালের মধ্যে উঠে এসে সুনীতির হাত ধ'রে তুলে নিয়ে গেল। সস্নেহ তিরস্কার ক'রে বল্‌ল, আমাদের ছেড়ে বুঝি একপাশে বসে আড্ডা দেবে? শেষকালে যে 'কাক ও ময়ূরপুচ্ছের' অবস্থা হবে!

এমন কিছু রসিকতা নয়, তবু ছোটমাসি সলজ্জ কুণ্ঠাটিকে যথাসম্ভব বজায় রেখে খিল খিল ক'রে হাসবার চেষ্টা করলেন। তিনি যেন এই হাসি দিয়েই তরুণীদের সঙ্গে একাকার হ'য়ে যেতে চান। কথা তিনি অনেকের সঙ্গেই বল্‌তে পারতেন, অনেকেই

তাঁর পরিচিত ; শৈবলিনী, বাব্‌লি, সুললিতা, ব্যারিষ্টার মিঃ লাহার বড় মেয়ে মেরী, শুর চৌধুরীর ছোট বোন নির্ঝরিণী— অনেকেই ত ইতিমধ্যে তাঁর দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে চুপ ক'রে গেল ! প্রথম সুযোগ ত্যাগ ক'রে শেষকালে গায়ে প'ড়ে আলাপ করা তাঁর রুচিতে বাধে। অবশ্য সব সময়ে বাধে না।

যে মেয়েটি টেবিলের ওপর অসাবধান হ'য়ে ব'সে একটি পা তুলে দিয়ে হাসাহাসি করছিল, ছোটমাসিমা তার মুখ ও পায়ের খানিকটা নিরাবরণ অংশের দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে কেউই সেদিকে দেখেনি, কিন্তু তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, পা খানির যৌবন অপরিমিত। তাঁর নিজের পা কোনোদিনই এমন সুন্দর ছিল না। লুকিয়ে দেখতে দেখতে এক সময় তিনি ইঙ্গিত ক'রে তাকে ডাকলেন, শোনো বলি বীথিকা ?

একটু বোধ করি উচ্চকণ্ঠেই ডেকেছিলেন, অনেকেই মুখ ফেরালো, তাড়াতাড়ি পায়ের ওপর কাপড় নামিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে এসে বীথিকা হেঁট হ'য়ে বল্‌ল, কি ছোটমাসিমা ?

পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে ছোটমাসি বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কেবলই কথা বলতে ইচ্ছে করে, তুমি ভারি সুন্দর ; আজ যে পায়ে আল্‌তা পরোনি ?

দূর, আমার কি বিয়ে নাকি যে আল্‌তা পরবো ? বলুন না

কি বলছেন—মাগো, আপনি কি মেখেছেন মুখে ছোটমাসিমা? পাউডার? একেবারে পুরু হয়ে উঠেছে যে!

অকস্মাৎ লজ্জায় আর অপমানে ছোটমাসিমার কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলো। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চারিদিকে তাকিয়ে অনুভব ক'রে নিলেন, বীথিকার উক্তি কেউ শুনতে পেয়েছে কি না। তারপরই তিনি বিবর্ণ মুখে বললেন, বসো না গল্প করি—একা একা ঠেকছে যে!

তাঁর গল্প শোনা বীথিকার অভ্যাস ছিল। পৃথিবীতে তিনি সকলেরই কিছু-না-কিছু উপকার করেছেন এবং এখন তাঁর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না, সবাইকেই তিনি চিনেছেন, এখন কে এবং কে তাঁর যেখানে সেখানে নিন্দা ক'রে বেড়ায়, কোন নিকটাত্মীয় এখনো অর্থাৎ এ বয়সেও কা'র সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয়াসক্তি রটনা করে—এই ছিল তাঁর গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি আলোকপ্রাপ্তা নারী, পরনিন্দা এবং পরচর্চ্চা তিনি ঘৃণা করেন, একথাও তিনি বল্‌তে ছাড়েন না। তাঁর কাছে খানিক-ক্ষণ বসলে যেন দম আটকায়।

আসছি ছোটমাসিমা—ব'লে বীথিকা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে স'রে গিয়ে এই কক্ষের সর্ব্বসম্মত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীটির কাছে ব'সে পড়লো। বসলো ছোটমাসির দিকে পিছন ফিরে এবং ব'সে পড়ে' এমন ভাবেই সে গল্প

জুড়ে’ দিল যে তার ওঠবার আপাততঃ কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

ছোটমাসিমা তাঁর পুরু দু’টি ঠোঁটের প্রান্তে আবার একটু স্নিগ্ধ হাসি টেনে ব’সে রইলেন। হাসি ফুটে থাকলে তাঁর মুখের চেহারা তবু লোকের চক্ষে এক রকম মানিয়ে যায়, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য্য—তা যেমন পীড়াদায়ক তেমনি শ্রীহীন।

ওদিকে তখন কক্ষের একান্তে ব’সে দু’টি মেয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে কানাকানি করছিল—

—সত্যি বল্‌ছি ভাই বিশ্বাস কর্‌……মাথার সুমুখের দিকে একেবারে চুল নেই, ছেঁড়া চুল কুড়িয়ে বুনে বুনে মাথায় আটকে রেখেছে। ঘোমটা থাকলে ধরবার যো আছে? আর সেমিজের তলায় কি কি পরেন শুন্‌বি?

দু’জনে খানিকটা হাসলো, তারপর ফিস্‌ফিস্‌ কর্‌ল এবং তারপর দু’জনেই লজ্জায় মুখ রাঙা ক’রে মাথা হেঁট কর্‌ল।

মাথা তুলে প্রথমটি আবার বল্‌ল, হ্যাঁ বিয়ে ওঁর হ’য়েছিল, স্বামীও আছেন শুনেছি।

দ্বিতীয়টি মাথা তুলে তার দিকে তাকাতেই সে পুনরায় বল্‌ল, বিয়ের পর দু’বছর দু’জনে বনিবনা ছিল, কিন্তু তারপর কে যে কা’কে ত্যাগ ক’রেছে আজও তা’ জানা যায় নি।

ত্যাগ? কেন?

তা' জানাজানি হ'লে ওঁর সঙ্গে লোকের মেলামেশা থাকবে কি ক'রে ?

তুমি এত জান্‌লে কোথায় ?

প্রথম মেয়েটি হাস্‌ল। বল্‌ল, এ ঘরে এমন কোনো মেয়ে নেই যার সঙ্গে উনি দু'একদিন কাটাননি। প্রথমে সবাই ওঁর কাছে আদর পায়, তারপর দু'দিনেই একে একে তারা ওঁর কাছে পুরোনো হ'য়ে যায়, আর তাদের ভালো লাগে না…… ওই ত নির্ঝরিণী দেবীর সঙ্গে উনি গিয়েছিলেন দার্জ্জিলিঙে, দুদিন পরে নির্ঝরিণী শুনলেন, হোটেলের এক সায়েবের সঙ্গে তিনি নিজে নাকি প্রণয়াসক্ত !……সাতদিনের দিন নির্ঝরিণী দেবী কাঁদতে কাঁদতে কল্‌কাতায় ফিরে এলেন। ছোটমাসিমা অকারণে মানুষকে ছোবল মারেন! নিজের ছোটভা'য়ের নামে এমন কলঙ্ক রটালেন যে, সে বেচারাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

এমন সময়ে দু' তিনটি তরুণী ও একজন যুবক ঘরে এসে ঢুকতেই সবাই আনন্দে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো। যে মেয়েটি সদ্য এসে দাঁড়ালো তাঁকে নিয়ে খানিকক্ষণ লোফালুফি চল্‌লো। বোঝা গেল সেই নব-পরিণীতা। যুবক ও মেয়েটিকে নিয়ে এতক্ষণে মজলিশ যেন আবার নূতন ক'রে মুখরিত হ'য়ে উঠলো।

নববধুর নাম তপোবালা। বধূ—কিন্তু এখানকার সকলের

অপরিচিত মেয়ে সে নয়। বিবাহের আগে থেকেই সকলের সঙ্গে তার আলাপ। বড়লোকের মেয়ে। আগে যারা ছিল বন্ধু এবং বান্ধবী, এখন তারা স্বামী এবং স্ত্রী।

সবাই ধরে বসলো তপোবালার গান শুনতে হবে। গান সে সুন্দর গায়। হারমোনিয়মটা টেনে এনে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে তপোবালার গান শুনতে বসলো।

ওকি, পালাচ্ছ যে বীরেনদা? একটি মেয়ে খপ্ ক'রে যুবকটির হাত ধ'রে এনে নিজেদের ভিড়ের মধ্যে তাকে আটক ক'রে রাখল। বল্‌ল, পালালেই হ'ল অমনি, এত লজ্জা আবার কবে জড়ো করলে?

গান শেষ হবার পর উঠে দাঁড়াতেই ছোটমাসিমার দিকে বীরেনের দৃষ্টি পড়ল। যে সমারোহ এতক্ষণ হ'য়ে গেল, এতে তাঁর কোনো স্থানই ছিল না, অনাদৃত উপেক্ষিত হ'যে বৈঠকের এক প্রান্তে ব'সে তিনি এতক্ষণ কি-যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন।

দু'জনে চোখাচোখি হ'তেই বীরেন ব'লে উঠলো, ছোট-মাসিমা, এসেছেন আপনি? সত্যি খুসী হ'লাম। ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে, আপনাকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। যে তাড়াতাড়ি……

সভাস্থ সবাই অকস্মাৎ স্তব্ধ এবং হতচকিত হ'য়ে ছোট-

মাসিমার দিকে তাকালো। সুমুখে যেন তাদের বজ্রাঘাত হয়েছে। একটি মেয়ে ত মুখের অস্ফুট শব্দ ক'রে প্রায় হতচেতন হবার উপক্রম করল। অনিমন্ত্রিত হ'য়ে ভদ্র-সমাজে আসা? বিশেষ ক'রে এই প্রীতিভোজের আসরে?

নিমন্ত্রণ করা হয়নি, আসরে ব'সে এ কথা শোনার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তবু ছোটমাসিমার মুখাকৃতি দেখে মনে হ'ল তাঁর এ অভিজ্ঞতা হয়ত নূতন নয়! যথাসম্ভব মৃদু এবং কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার নেমন্তন্নর অপেক্ষা রাখবো কেন ভাই, এ ত আর পরের বাড়ী নয়!

বয়সে বড় বলে' সবাই তাঁকে প্রকাশ্যে সমীহ ক'রে, নৈলে তাঁর এই উক্তির ওপর এক-আধটা মন্তব্য কোন কোন মেয়ের মুখে এসেছিল।

বীরেন সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমাদের বিয়ের গোড়ায় ছোট-মাসিমার কতখানি হাত ছিল তা বোধ হয় এখানে সকলেই জানেন।

অনেকে এবার খানিকটা সুস্থ বোধ করল। সুললিতা ব'লে উঠল, এমন ঘটকালি যিনি করলেন, তাকে নেমন্তন্ন করলেন না?

ঘটকালি ত নয়, ভাবী স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে কলঙ্ক রটনা!— ছোট-মাসিমা হেঁট মুখে ব'সে রইলেন।

নিজের হাতটা মুখের কাছে ধ'রে অলক্ষ্যে একবার ছোট-

মাসির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বীরেন বল্‌ল, ভুল হ'য়ে গিয়েছিল!—কথাটা ব'লেই সে আর দাঁড়াল না, কি একটা কাজের ছুতো ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে' গেল।

আহারের আয়োজন হয়েছিল যথারীতি। বাইরে থেকে আহ্বান এবং অনুরোধ আসতেই মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। নীচে অনেকের মোটর এবং অন্যান্য যান-বাহন অপেক্ষা করছে। রাত প্রায় দশটা বাজে।

একে একে সবাই বেরিয়ে যেতেই ছোটমাসি পড়লেন একা। তাঁকে কেউ ডাকলো না, তিনি যে পিছনে রইলেন সেদিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। অনেকক্ষণ এমনি করে' কাটবার পর আহত অপমানে এক সময়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতে ছিল তাঁর একটি 'স্যাচেল্'—এটি তিনি যে কোনো জায়গায় যাবার সময় হাতে ঝুলিয়ে যান্। পাত্‌লা কাঁচের সৌখীন চশমাটি একবার খুলে তিনি মুছে নিলেন তারপর স্যাচেল্‌টি খুলে' ভিতরটি একবার দেখলেন, তাতে আছে ছোট একটি আয়না, কিছু পয়সা ও একখানি নোট-বই। পরে সেটি আবার বন্ধ করে' তিনি বাইরে এলেন। বকের মত তাঁর চলনের ভঙ্গী।

এদিকের সমস্তটাই মেয়ে-মহল। সারি সারি ঘরগুলিতে এবং ওদিকে ফেরঙ্গ-কায়দা অনুসারে টেবিল এবং চেয়ার সাজিয়ে প্রচুর পরিমাণে হিন্দু-মুসলমান-সম্মত আহারের আয়োজন

হয়েছিল। চারিদিকে এত আলো যে মুখ লুকোবার কোথাও গোপন স্থান ছিল না! ছোটমাসি এদিকের খোলা ছাতটার ওপর এসে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে তাঁর আদর কেন যে নেই তা তিনি মনে মনে ঠাওরাতে লাগলেন। যে মেয়েদের দীপ্ত যৌবন-শ্রী, অপরিমিত যাদের প্রাণ-প্রাচুর্য্য, অপরিসীম যাদের দেহ-লাবণ্য —এ বাড়ীর সবাই যেন সর্ব্বাগ্রে তাদের সমাদর করতেই ব্যস্ত। বিগতযৌবনা নারীর ঠাঁই এখানে নেই। সুন্দরী নারী-দেহের পদতলে আজো সভ্য জগৎ গড়াগড়ি দিচ্ছে। ছোটমাসিমার মনে হলো, পৃথিবীর সবাই তাঁকে বাতিল করে' দিয়েছে।

—একটু সরুন ত' ?—না না, ওইদিকে গিয়ে দাঁড়ান্। এটা আমাদের যাতায়াতের পথ কি না!

সরে' দাঁড়াতেই একটি ছেলে এক চাঙারী খাবার নিয়ে মেয়েদের দিকে ছুটে গেল।

ছোটমাসিমা হেঁট হয়ে নিজের আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টাই করছিলেন, সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই একবারে তপোবালার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সে চলেছিল তখন বান্ধবীদের অভ্যর্থনায়।

চললেন? খাওয়া হলো না ছোটমাসিমা?

ছোটমাসিমা একটু হেসে তার একটি হাত ধরলেন। যে সম্মান তিনি হারাতে বসেছিলেন, তপোবালার হাতটি ধরে' তিনি

সে গৌরব পুনরায় অর্জ্জন করে নিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রণ না করার জ্বালা তখনো বোধ হয় তাঁর মধ্যে রি রি করছিল। তিনি বললেন, শোনো বলি, কতদিন তোমাকে দেখিনি বলত' তপোবালা ?

তপোবালার কাঁধে হাত রেখে তিনি দু'পা এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, রাতে খাওয়া আমার সয় না সে ত' তোমরা জানই……চলেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমার দেখা বুঝি আর পাওয়া গেল না। একটি কথা তোমায় বলে' যাই তপোবালা।

ভিতর থেকে তপোবালার ঘন ঘন ডাক পড়ছিল। তবু আজকের এই আনন্দের মাঝখানে ছোটমাসিকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। তাঁর সঙ্গে সে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

ছোটমাসি বললেন, আজ তোমাকে বেশ মানিয়েছে ভাই! তুমিই যা একটু আমাকে ভালোবাসো। আপনার চেয়ে পর আমার বেশী আপন।—এই বলে' তিনি তপোবালার বুকের ওপর ডান্ হাতখানা রেখে একটুখানি হেসে আবার বললেন, ছোক্‌রা স্বামী আর বৃদ্ধ স্বামী এদের সত্যিই বিশ্বাস করা উচিত নয়, তা তুমি যাই বল তপোবালা।

তপোবালার এ বিসদৃশ আলোচনা করবার সময় ও রুচি

ছিল না, সে উত্যক্ত ত' হলোই, সমস্ত মনটা তার বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

ছোটমাসি বললেন, হ্যাঁ তোমার স্বামীর কথাই বল্‌ছি—বীরেন সব দিকেই ভালো ছেলে, চেহারাও চমৎকার······কিন্তু ওর দোষ কি বল, ছেলেমানুষ বৈত নয়, তোমার এত ভালোবাসা এখনো ভাল করে' ও বোঝে না!

স্থির হয়ে তপোবালা দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

বল্‌তে আমার ইচ্ছেই ছিল না তপোবালা······এই তোমার এই ধরো পাঁচ মিনিট আগে—আমি ওই অন্ধকারটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম কি না, দেখলাম ছাতের পাঁচিলের কাছে এসে কা'রা যেন দাঁড়ালো ছায়ার মতন। অবিশ্যি বীরেন আর সুললিতাকে চিন্‌তে আমার একটুও দেরী হলো না······কিন্তু কী কান্না সুললিতার! বীরেনই বা কী করবে বল, সুললিতাকে ও যে সত্যিই ভালোবাসে! অন্ধকারে দেখলাম ভাই তোমার স্বামী,—চুপি চুপি তিনি বললেন,—সুললিতাকে জাপ্‌টে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে—

ছোটমাসি, ছিঃ!

ছোটমাসির চমক ভাঙলো। তীব্রকণ্ঠে তপোবালা বল্‌ল, আপনার অনেক অন্যায় সয়েছি কিন্তু মিথ্যে বদ্‌নাম সইবো না!—এই বলে' সে হাস্‌ল, হেসে বল্‌ল, আপনার শর-সন্ধান

ব্যর্থ হলো ছোটমাসিমা। সুললিতা আধ ঘণ্টা ধরে' খেতে বসেছে, আর উনি গেছেন তালতলায় পিসিমাকে পৌঁছে দিতে।— তারপর ঘৃণায় নাসাকুঞ্চিত করে' তপোবালা আবার বল্‌ল, বুঝতে পেরেছি, আপনি আজকের এই উৎসবে বিষ ঢেলে দিয়ে যেতে চান। এই জন্তে আমিই বারণ করেছিলাম আপনাকে নেমন্তন্ন করতে। যান্ আপনি।

তপোবালা নিজেই সেখান থেকে দ্রুতপদে চলে' গেল।

ছোটমাসির সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে' কাঁপছে। তবু তিনি অতি কষ্টে ছাতাটি ও 'স্যাচেল্'টি হাতে চেপে ধরে' সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। কিন্তু মাথাটা বোধ হয় তাঁর ঝিম্ ঝিম্ করছিল। নামতে নামতে শেষের সিঁড়িতে হোঁচট্ খেয়ে পড়লেন। আছাড় খেলেন না বটে কিন্তু হঠাৎ চাড় লাগতেই মুখের ভিতর থেকে তাঁর নকল একপাটি দাঁত খুলে প্রায় ছিট্‌কে বাইরে পড়েছিল আর কি, তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে দাঁতের পাটিটাকে আবার যথাস্থানে সংযোগ করে' দিয়ে তিনি বাইরে এলেন।

বাগানটা পার হয়ে যাবার সময় অন্ধকারে তিনি একবার থম্‌কে দাঁড়ালেন। আলোয় হাসিতে আনন্দে গানে ও সুন্দরী তরুণীগণের অপরিমিত প্রাণচাঞ্চল্যে এই বিস্তৃত প্রাসাদ অভিনব জীবনের রসে তখনো টল্ টল্ করছে। একবার মাত্র সেদিকে

তাকিয়ে ছোটমাসিমা ফটক পার হয়ে পথে নেমে ডান্ দিকের গলির পথ ধরলেন।

অনেকদূর থেকে একটা গ্যাসের আলো এসে পথের ওপর পড়েছিল। জনহীন পথ। চলতে চলতে তিনি একটা জলের কলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আঃ তৃষ্ণায় তাঁর ভিতরটা একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। গলাটা একটুখানি ভিজিয়ে নেবার জন্য তিনি কল টিপ্‌লেন কিন্তু জল পড়লো না। কলের জল তখন চলে' গিয়েছিল।

কলের লৌহ-দেহের ওপর ভর দিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে কাঁচের চশমার নীচে দিয়ে তাঁর অবারণ অশ্রুর ধারা গালের ওপর গড়িয়ে এল। সে-অশ্রু কেবল অপমানের এবং উপেক্ষারই নয়, বিগত যৌবনের করুণ ব্যর্থতারই নয়, কিম্বা যে কলঙ্ক রটনার জঘন্য কৌশল একটু আগে তাঁর নির্ম্মম ভাবে মিথ্যা হয়ে গেছে তার জন্যও নয়,—আপনার শূন্য জীবনের সকল দৈন্যকে তিনি আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন, এ অশ্রুতে তার বেদনাও হয়ত নিহিত ছিল।

ছন্দোপতন

পরিচয় ঃ সামাজিক ও সংস্কারবদ্ধ মানুষের তথাকথিত নৈতিক চেতনার সঙ্গে দু'টি জনপ্রিয় স্ত্রী-পুরুষের সংঘাত ও লাঞ্ছনা —তাই নিয়ে এই গল্প।

প্রকাণ্ড কৃষি-শিক্ষা-কেন্দ্রটিকে আশ্রয় করে' বেশ একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে' উঠেছিল। চাকুরে ছিল জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, কিন্তু বাঙালীর সংখ্যাই বেশী।

বাঙালী-অঞ্চল একটু দূরে; আলাদা হাল-চাল, ভিন্ন রীতি-নীতি। তবে সুসংবাদ এই, স্বল্প সংখ্যক বাঙালীর মধ্যে বন্ধুতা এবং সহানুভূতির অভাব দেখা যেত না। সবাই ছিল উদার এবং পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী; অন্ততঃ, বাইরে থেকে তাই মনে হতো।

চাকুরে বটে, কিন্তু সবাই কেরাণী নয়। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা ওভারসিয়ার। তা বলে' কেরাণী কি আর কেউ ছিল না? ছিল!

যে ছোকরা-ডাক্তারটি নতুন এসেছেন, তিনি খুব সৌখীন লোক। নিজের কোয়ার্টারটিকে এরই মধ্যে আশ্চর্য্য রকম তিনি আকর্ষণীয় করে' তুলেছেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এ দিকটা সন্ধ্যার পর থেকে এক রকম নিশুতিই থাকতো, এখন এখানে নিত্য অতিথি-অভ্যাগতের নিয়মিত যাতায়াত, হাসি-তামাসা, কলধ্বনি, গান-বাজ্‌না;—এবং এই গান-বাজনাই ছিল ডাক্তারের প্রিয় বস্তু।

শুধু তাই নয়; ডাক্তারের স্ত্রীটিও ছিলেন সবিশেষ সঙ্গীতানুরাগিনী। নাম পদ্মা। গানের গলাও যেমন তার

আশ্চর্য্য, বেহালার হাতও তেমনি চমৎকার। দুপুর বেলায় বাঙালীর মেয়েরা সবাই পদ্মার গান শুনতে আসেন।

কোলে এক-বছরের একটি ছেলে। সারা ঘরে, দালানে, উঠোনে, হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়।—কি দুরন্ত ছেলেরে বাবা, কাজ-কর্ম্ম অম্‌নি সব ভণ্ডুল ক'রে দেয়!

দুষ্টু!—চোখ পাকিয়ে হেসে পদ্মা বলে—কার্পেটের ফুল যদি আজ শেষ করতে না দাও তাহলে যে—

ছেলের মুখটি মুখের কাছে এনে পদ্মা পুনরায় বলে—তোমার বাবা যে রাগ কর্‌বেন! নাঃ বাবা রে বাবা, সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে একশা করে দিল। আমি কাঁদি?

কৃত্রিম অভিমানে মাকে কাঁদতে দেখে ভোম্বলের ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে।

ছেলেটিকে কেন্দ্র করে' পদ্মার যত অশান্তি. যত উচ্ছলতা। নদী যেমন আবর্ত্তে ঘুরে ঘুরে চলে, ছোট শিশুর দুরন্তপনায় পাক খেয়ে পদ্মা তেমনি সারাদিন ছুটে চল্‌ত।

স্বামী-আর স্ত্রী—যেন হর-পার্ব্বতীর মিলন!

কেউ বল্‌ত—লক্ষ্মী! রূপে-গুণে! গান-বাজ্‌না জানে, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ জানে, কিন্তু গেরস্থালীতেও যে এমন পাকা গিন্নি—বাঃ, হিংসে করতে গেলেও লজ্জা হয়!

ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী চশমাটি চোখে তুলে দিয়ে সুন্দরী হেমাঙ্গিনীর প্রতি কটাক্ষ করে' বলতেন—আর রূপ ?

ধীরে ধীরে হেমাঙ্গিনীর মাথা হেঁট হয়ে আস্‌ত।

বাঙালী মেয়েদের সমাজে পদ্মার ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। পুরুষরা কাজে বেরিয়ে গেলে মেয়েদের একটি জটলা বসে। কোনো না কোনো রূপে পদ্মাই তাঁদের আলোচনার কেন্দ্র। রূপের প্রশ্ন হোক, সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন হোক, শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্নই হোক—পদ্মার মধ্যে এ গুলির সুসমন্বয় লক্ষ্য করে' মেয়েরা অবাক্ হয়ে থাকে।

ললিতা রোজ সেতার শিখতে আসে। আগামী আষাঢ়ে তার বিয়ে। পাত্র প্রস্তুত। ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটি যেমন ভদ্র তেমনি মাধুর্য্যময়ী।

—বৌদি, আজ তোমার বাড়ী ঢুকতে ভারি লজ্জা করছে।

তবে তোদের বাড়ী আমায় নিয়ে চল্ ?—পদ্মা বলে।

না সত্যি, কাল তোমার নতুন সেতারের বড় তারটা ছিঁড়ে ফেললাম! কি অন্যায় বল ত ?

পদ্মা বলে—তার ছিঁড়েছিস্, সুর কাট্‌তে ত আর পারিস নি !

ললিতা হাসতে হাসতে গিয়ে ভোম্বলকে বুকের ওপর তুলে নেয়। পদ্মা চোখ রাঙিয়ে বলে—ছেলেকে নিয়ে যে তুমি যন্তরে হাত দেবে না, এ-রকম ফাঁকি দিলে চলবে না কিন্তু, আমি এখন মাষ্টার মশাই !

ললিতা বলে—আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে মাষ্টার মশাই!

মাষ্টার মশাই একটু হেসে বলেন—ভাবী স্বামীর প্রেমে পড়েছ নাকি?

দূর!—বলে' ছেলেটিকে ধুপ করে' মাটিতে নামিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে একেবারে সটান্ ললিতা নিজেদের বাড়ী পালায়।—মুখে আগুন বৌদির!

কিছুক্ষণ পরে বড়-পিসীমা এসে এক পা ঘরের মধ্যে দিয়ে বলেন—কই গো, মাথার মণি কই?

ভিতর থেকে পদ্মা বলে—মাথার মণি ধূলোয় লুটোচ্ছে পিসিমা!

ষাট্ ষাট্, কেন গো?

আর কেন! দেখুন না!

পিসিমা এসে দেখেন, পদ্মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। চোখ টিপে হেসে তিনি বললেন—ওমা কি হবে গো! কোথা যাবো! ঝিয়ের আসনটা কি তুই অদল-বদল করে' নিলি?

পিসিমার রসিকতার একটি চমৎকার উত্তর পদ্মার মুখে এসেছিল, কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল—ঝি আর কত পারবে বলুন, বুড়ো মানুষের একার সাধ্যে কুলোয় না!

ভোম্বল কোথা গেল?

তার কথা আর বলবেন না! দাইয়ের কাঁধে চড়ে' দেশ-জয়ে বরিয়েছে।

বসবার একটি আসন দিয়ে পদ্মা বলে—আজ তোমাকে একটি ভাল জিনিস খাওয়াবো পিসিমা।

পিসিমা বলেন—সেই জন্যেই ত এলাম! তোর বাড়ীতে ভাল ভাল জিনিস খেতেই আসি, তা বুঝি এদ্দিনে তুই—?

মুখে তাঁর হাত চাপা দিয়ে পদ্মা বল্‌ল—মানুষকে লজ্জায় ফেল্‌তে তুমি একটি! আমি কি তাই বললাম?

বাইরে কার ছায়া দেখা গেল। মুখ বাড়িয়ে পদ্মা দেখ্‌ল—হাঁ, হেমাঙ্গিনীই বটে!

এসো ভাই হেমাদি'? এই বেতের চেয়ারটা নিয়ে বসো। চায়ের জল চড়িয়ে তোমাদের ডাকৃতে যাবো ভাবছিলাম।

হেমাঙ্গিনী বিবাহিতা মেয়ে। বয়স বছর পঁচিশ। সন্তানাদি নেই। বহুদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে কি জানি কি কারণে মনো-মালিন্য,—শ্বশুর-বাড়ী যায় না!

কথাবার্ত্তা হেমাঙ্গিনী একটু অল্পই বলে। মুখে হাসি তার সহজে আসে না।

পদ্মা বল্‌ল—গান শুন্‌বে হেমাদি'?

হেমাঙ্গিনী ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—তাই ত এলাম!

এসরাজের একটা সুর ধরে' পদ্মা একটি চমৎকার গান সুরু করে' দিল। গানের আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটে এসে হাজির। ললিতা, মনোরমা, ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী, হারাধন ডাক্তারের স্ত্রী,

সরস্বতী, রায় বাহাদুরের বোন—সবাই এলেন। ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী চশমাটা ভাল করে' একবার মুছে নিয়ে আবার চোখে লাগিয়ে হেমাঙ্গিনীকে কিছুক্ষণ স্পষ্ট করে' দেখে নিলেন।

গান শেষ করে' পদ্মা বল্ল—বেশ, আজ থেকে এই নিয়মই বাহাল রইল, চায়ের জল চড়িয়ে ডাকতে যাবার চেয়ে একটা করে' গর্দ্দভ-রাগিণী ধরব, সবাই এসে হাজির হবে।

সবাই হাসল। (ভাল যাকে বাসা যায়, সকল কথাই তার ভাল লাগে।) পদ্মা সবার কাছে নারী-জাতির গৌরবের ধন!

বড় পিসিমা এতক্ষণ চুপ করে' ছিলেন। এবার বললেন—সবাই রয়েছে তবুও বলি, ও-হাতে ঝাঁটা আর ধরিস নে পদ্মা!

একটু সলজ্জ হেসে উঠে যাবার আগে পদ্মা বল্ল—হেমাদি', গান কেমন লাগল?

হেমাঙ্গিনীর হয়ে ইঞ্জিনিয়ার-পত্নী উত্তর দিলেন—এ কি আবার জিজ্ঞেস করবার কথা মা?

পদ্মা সবাইকে পেয়ালা করে' চা ও রেকাবি করে' জলখাবার এনে দিল। সবাই সানন্দে হাত বাড়িয়ে সেগুলি গ্রহণ করলেন। শুধু সেগুলি আহার্য্য বস্তু বলে' নয়—এই মেয়েটির যৎসামান্য প্রীতির দানকেও তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করে' অপরিসীম তৃপ্তি পেতেন।

রায়-বাহাদুরের ছোট বোন সরোজিনী আজ দিন তিনেক

হলো শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছেন, আপাততঃ চলে' যাবার ইচ্ছে তাঁর নেই। পদ্মা একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে মনোরমাকে বল্‌ল —উনি যে খেতেই পাচ্ছেন না!

সরস্বতী চট্ করে' মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন—লজ্জা করে' খেও না ভাই, এ বাঙলা দেশ নয়; জল-হাওয়ার গুণ এম্‌নিই যে লজ্জা করে' খেলে ঠক্‌তে হয়।

ইঞ্জিনিয়ার-পত্নী এবার চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে সত্যিই হেসে উঠলেন। শেষ একটি হাসির পর সাধারণতঃ সভা ভাঙে।

পরিপূর্ণ দিনের আলোয় যেমন একটি আনন্দের বার্ত্তা আসে, নিবিড় রাত্রির একটি নিঃশব্দ মাধুর্য্যও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর কাছে সমান আনন্দ বহন করে' আনে। দুজনের প্রেমের মধ্যে একটি সুন্দর স্নিগ্ধতা ছিল। তার মধ্যে যেটুকু উচ্ছ্বাস, যেটুকু ফেনা, যেটুকু অকারণ—সেটুকু মিলিয়ে গিয়েছিল এবং যেটুকু স্থির, শিল্পসম্মত এবং সৌন্দর্য্যময়, সেইটুকুই প্রকাশ পেয়েছিল।

সেদিন যতীন বল্‌ল—তুমি ত সব পারো? এত মেয়েভক্ত জোটালে কোত্থেকে বল ত'?

পদ্মা হেসে বল্‌ল—তোমার ভক্তের দল ত আমার চেয়েও বেশী!

আমরা বোধ হয় মন্তর জানি! কি বল?

মন দিলে মন্তরের দরকার হয় না!

যতীন বল্‌ল—আচ্ছা, সত্যিই কি সবাই আমাদের ভালবাসে পদ্মা?

পদ্মা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালো। পরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌ল—ছি ছি, মানুষকে সন্দেহ করবার প্রবৃত্তি আমার যেন না আসে! কি বললে তুমি?

স্বামী-স্ত্রীর অতিথি-বাৎসল্য এবং বন্ধু-প্রীতি পাড়াপ্রতিবেশীদের অন্তরের অতি সন্নিকটে এনে রেখেছে। কাজে-কর্ম্মে, উৎসবে-আয়োজনে, পাল-পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে তাই পদ্মা ও যতীনকেই তাদের মনে পড়ে। 'সধবার' মাথায় সিঁদুর দিয়ে কোনো বার-ব্রত করতে গেলে একে একে সবাই পদ্মার কাছে আসে। পদ্মা ছিল তাদের সমস্ত কর্ম্ম-জীবনকে আচ্ছন্ন করে'।

যতীন কোনো কোনো পূজার মন্ত্র জান্‌তো। পুরোহিতের প্রয়োজন কোথাও হলে' তাকেই ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকে মন্ত্র পড়িয়ে পূজা সেরে নিত। তা ছাড়া 'ভেট' 'তত্ত্ব' 'সিধে'—এ সব তা তার ঘরে প্রায় নিত্যই এসে জমা হতো। প্রতিদিন সকাল থেকে সুরু করে' রাত্রি পর্য্যন্ত স্নেহভাজন এবং শ্রদ্ধাভাজনের ভিড়ও যেমন তাদের ঘরে লেগে থাকতো, তেমনি এই সময়টুকুর মধ্যে স্নেহের ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে নানারূপ ভোজ্য, উপভোগ্য, এবং পরিধেয় বস্তু তার ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে উঠতো।

পদ্মা বল্‌ল—বিপদে পড়লাম ! ব ত ?

যতীন বল্‌ল—তাই ত, এত জিনিস রাখি কোথায়, ভালবাসার উচ্ছ্বাসকে এড়াই কি করে' ?

পদ্মা একবার তাকিয়ে দেখলো, প্রতিবেশীর প্রীতির দানে ঘর-দোর একেবারে প্লাবিত হয়ে গেছে, আর তারই মাঝখানে বসে' ভোম্বল পরমানন্দে সমস্ত ওলোট-পালোট করতে সুরু করেছে।

করুণ দৃষ্টিতে সেগুলির দিকে একবার তাকিয়ে পদ্মা বল্‌ল—এত নষ্ট আমি বাপু সহ্য করতে পারিনে, বড়-পিসিমাকে ডেকে না হয় কাল একবার—

যতীন তাড়াতাড়ি এসে তার সেই সুন্দর আরক্ত অধরের ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল—চুপ, ও-কথা মনেও এনো না ! এ যে জন-সাধারণের ভালবাসা,—এ যেমন অন্ধ, তেমনি বিবেচনাহীন। ওদের ভালবাসাকে সংযত করতে গেলে গালাগাল দিয়ে উঠ্‌বে ! আজও এ-কথা বুঝতো পারোনি ?

পদ্মা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী—কিন্তু স্বামীর এ মন্তব্যের পর তার দুটি আয়ত সরল দৃষ্টি দেখে মনে হতো, সত্যি—স্বামীর অনুপাতে সে যে কিছুই জানে না !

মনে হতো, স্বামীর কোনো বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে সে নিতান্ত শিশুর মত আত্মদান করেছে !

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অপরাহ্ণ-বেলায় সবাই বেড়াতে

মন দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে সবাই এক সঙ্গে। কাছেই একটা ছোট জঙ্গল! সেটা পার হয়ে গেলে ক্ষুদ্র একটা নদীর বাঁক পাওয়া যায়। বিকাল-বেলা এই বাঁকের ধারে এসে সবাই জড়ো হয়; ছেলে-মেয়েরা খেলা করে; মেয়েরা কেউ কেউ হয় ত গানও গায়, পুরুষেরা কাজের সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা বলে। পদ্মা ছিল এই মেয়ের দলের সভানেত্রী। মেয়েদের মনের মত ভাল ভাল গল্প বলতে পারতো সে চমৎকার!

সন্ধ্যা হতে সবাই ফেরে। আগে মেয়েরা, পিছনে পুরুষরা। একটু একটু অন্ধকার হয়ে আসছিল। পাশ থেকে আওয়াজ এল—যতীনের গলা না?

মিষ্টার রায় ও যতীন একসঙ্গে আসছিল। মুখ ফিরিয়ে যতীন বল্‌ল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যে দলছাড়া হয়ে পড়েছেন মাসীমা?

এই আমার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বল্‌ছি, আজ নতুন এসেছে কি না! এর মধ্যেই তোমরা বাসায় ফিরচো? আজ ভাবছিলাম তোমার ওখানে গান শুনতে যাবো আমার মেয়েকে নিয়ে!

মিষ্টার রায় বললেন—মাসিমা, গুড্ ইভ্‌নিং!

মাসিমা বললেন—বেঁচে থাকো বাবা!

মেয়েটি মায়ের পাশ থেকে এতক্ষণ যতীনের প্রতি তাকাচ্ছিল, এবার একটু সরে' এসে বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌ল—আপনি এখানে?

হঠাৎ একটু থতিয়ে গিয়ে যতীন বল্‌ল—কেন বলুন ত ? আমায় চেনেন নাকি ?

খুব ভাল করেই চিনি ! কল্‌কাতায় আমার শ্বশুরবাড়ীতে আপনি ভাড়াটে ছিলেন, মনে নেই ? চলে’ আসতে কেন হয়েছিল তাও নিশ্চয় আপনার মনে আছে !

ওরে বাবা, এ কি কণ্ঠস্বর ! মেয়েটির গলার আওয়াজ শুনে সবাই হতচকিত হয়ে চুপ করে’ রইল।

সে পুনরায় বল্‌ল—আপনার সঙ্গে এখনও আছে ত সেই ছুঁড়ি ? সে কে আপনার শুনি ?

আমার সঙ্গে ? আমার স্ত্রীর কথা বলছেন ?

স্ত্রী ? ও মাগিটা স্ত্রী আপনার ?

নিশ্চয়ই ! এ ত’ সবাই জানে !

মেয়েটি মুখ বিকৃত করে’ বল্‌ল—মিথ্যে কথা ! [illegible]ইকে আপনি তাই জানিয়েছেন ! ও হ’ল কায়স্থর মেয়ে, আর আপনি বামুন ! আমাকে আর বাজে কথা বলে’ ভোলাবেন না, আমি একটু চালাক মেয়ে ! বিয়ে না-করা বউকে ভদ্রসমাজে চালিয়ে দিতে লজ্জা হল’ না আপনার ?

মিষ্টার রায় হঠাৎ এগিয়ে চল্‌তে সুরু করে দিলেন। তাঁর পিছনে যেন বজ্রাঘাত হয়েছে !

অবশ্য ওইটুকুই যথেষ্ট ! মায়ের হাত ধরে’ তাঁর তেজস্বিনী

কন্যাও ক্ষুব্ধ রোষে ও মৃদু গর্জ্জন সহকারে এগিয়ে চল্‌তে লাগলো!

পিছন থেকে যতীন একবার ডাকলো—মাসীমা?

মাসীমা কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন; এবং এমন ভাবেই চল্‌তে লাগলেন যে, মনে হয়, তাঁরা কোনো দস্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করছেন!

বেদনার বিবর্ণতায় সমস্ত দিনমান ম্লান হয়ে আছে। আনন্দ করেছে আত্মহত্যা! স্নেহ, প্রীতি, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি—যেন কোন কঠিন আঘাতে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা গেছে!

ললিতা গান শিখতে আর আসে না। পিসিমার স্নেহের শাসন নীরব। ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীর সুমুখের জান্‌লাগুলি বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। পদ্মার গান শোনবার আগ্রহ আর কারো নেই!

গলা বাড়িয়ে পদ্মা একবার পাশের বাড়ীর মনোরমাকে ডেকেছিল, কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। সরস্বতীকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিল, তিনি পদ্মাকে দেখেই শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে' নাক ডাকাতে সুরু করেছিলেন!

সমস্ত দিন এখন পদ্মার একা কাটে। বন্ধুত্ব না পাওয়া এক রকম, কিন্তু পেয়ে হারানো আর এক রকম! পদ্মার চোখে জল আসে!

একাকী ভোম্বল আজকাল আর খেলাধূলো করতে পারে না! এ-কোল থেকে ও-কোলে যাবার লোক এখন আর নেই। খানিকক্ষণ দুরন্তপনা করেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোয় একেবারে অকাতরে! শিশুর মনেও যেন একটি অবসন্নতা এসেছে।

এ কি হল গো, এ যে দম আট্‌কায়?

যতীন বলে—দম আট্‌কালে চল্‌বে কেন পদ্মা, এ হচ্ছে পাপের শাস্তি!

পাপ!

নয় ত কি? তোমাকে বিয়ে করিনি এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে?

উত্তেজিত কণ্ঠে পদ্মা বলে—চুলোয় যাক্‌, কেউ না আসুক—আমরা বেশ আছি।

করুণ একটুখানি হেসে যতীন বেরিয়ে চলে' যায়।

কিন্তু সবাইকে ত্যাগ করলে মানুষের চলে না! কারো সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না করলে ব্যক্তিগত প্রেমের জীবন মানুষের কাছে নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। জনসমাজকে ত্যাগ করা মানে আত্মহত্যা করা!

সবাই যারা আজ দূরে সরে' গেছে, তাদের সকলের জন্য পদ্মার অন্তর ক্রমে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ত্যাগ করে গেলে ত'

চল্‌বে না! সকলকে যে আপন করে' নিতে হবে! তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে সকলের মধ্যে যে বাঁচতে চায়!

পদ্মা বল্‌ল—সকল জায়গায়ই কি আমায় এম্‌নি লাঞ্ছনা সইতে হবে?

যতীন বল্‌ল—সকল জায়গায় এবং সমস্ত জীবন ধরে'!

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পদ্মা বল্‌ল—এত আঘাত কি তুমি সইতে পারবে?

যতীন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—আমি তোমার কথাই ভাবি পদ্মা।

এম্‌নি করে' এই বিচ্ছিন্ন, একক, বঞ্চিত দুটি নরনারীর নিরানন্দ দিন কাট্‌তে থাকে! বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নয় এইটুকুই যথেষ্ট—আর কিছু তাদের শোনাবার প্রয়োজন ছিল না! তার মধ্যে না ছিল ধৈর্য্য, না ছিল ক্ষমা, না সহানুভূতি!

বিবাহিত নরনারী নয়—এর চেয়ে বড় অকল্যাণ সমাজের আর কি থাকতে পারে!

সিংহাসন চুরমার হয়ে গেল! মাথার মণি ধূলোয় লুটোলো; আন্তরিকতা পদদলিত ও বিধ্বস্ত হয়ে গেল! এতদিনের এত যত্ন, এত আদর, এত আত্মীয়তা, এত ঐকান্তিকতা—আজ ওরা তার কোনো মূল্যই দিল না!

হঠাৎ মুখে-চোখে কাপড় চাপা দিয়ে পদ্মা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

যতীন বল্‌ল—অনেক চোখের জল পড়েছে—বুঝলে, কিন্তু এ ভিত্‌ টলেনি! তুমি টলাতে চাও তাকে?

কান্নায় পদ্মার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। বল্‌ল—না, তা আমি চাইনে, শুধু এদের সবাইকে আমি ভালবাসতে চেয়েছিলাম!

তার দাম ত পেলে, আবার কি চাও?

পদ্মা মুখ-চোখ মুছ্‌ল; উত্তেজনায় সে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল। চুলগুলি ঠিক করে' নিয়ে মাথা উঁচু করে' বল্‌ল—বেশ, তবে আর একবার দেখেই আসি!—বলে' তাড়াতাড়ি সে একটা চাদর টেনে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের কাছে গিয়ে সে কৈফিয়তের দাবি করবে!

সুমুখেই বড়-পিসীমার বাড়ী। ভিতরের দালানে সবাই জটলায় বসে' ছিল। পদ্মাকে দেখেই একজন তাড়াতাড়ি এসে আসনখানা মাটি থেকে তুলে নিয়ে চলে' গেল। অপমানে পদ্মার মুখ একেবারে কালি হয়ে এল। যা বলতে এসেছিল সমস্তই সে ভুলে গেল। তবু একটু থম্‌কে বল্‌ল—পিসিমা, আমি কি অন্যায় করেছি যে এম্‌নি করে' তোমরা—?

হেমাঙ্গিনী কোনোদিন বেশী কথা কয় না। আজ হঠাৎ ফেটে উঠে বল্‌ল—এটা লেকচার দেবার জায়গা নয়, গেরস্থর বাড়ী।

পিসিমা মুখ ফিরিয়েই রইলেন, কোনো কথা বল্‌লেন না। ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী চশমাটা ভাল করে'চোখে লাগিয়ে বললেন—গেরস্থ বাড়ীতেও লেক্‌চার দেওয়া যায়, কিন্তু তুমি তার যোগ্য নও। আমি জানিনে তুমি আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছ কেমন করে'?

অপরাধীর মত পদ্মার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কি প্রতিবাদ সে করতে পারে!

সরস্বতী একটি কাঁথা সেলাই করছিলেন। বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি!—ওরে বাপ রে, এত জানতাম না! কথায় বলে—'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!' ভাগ্যি সময় থাকতে ধরা পড়েছিলে ভাই!

তবুও দাঁড়িয়ে আছে দেখে হেমাঙ্গিনী অধীর হয়ে বল্‌ল—ব্যবসাটা খুলেছ বেশ, গান-বাজনাও ত জানো! শহরে গিয়ে দোকান একটা পাতলেই ত হয়!

সবাই খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে উঠে হেমাঙ্গিনীর কথায় সায় দিল!

সুস্পষ্ট এই ভয়ানক অপমানকর ইঙ্গিতটা শুনে পদ্মা একেবারে শিউরে উঠলো; পরে নিজেকে দমন করে' সহজ গলায় বল্‌ল—মাথা পেতেই নিলাম। প্রার্থনা করি পরের জন্মে যেন ঠিক এই কারণেই আবার তোমাদের কাছ থেকে ঠিক এম্‌নি অপমানই মাথা পেতে নিয়ে যেতে পারি!

বলতে বলতে লাঞ্ছিতা, আহতা, উপেক্ষিতা পদ্মা সিংহিনীর মত মাথা উঁচু করে' আবার বেরিয়ে চলে' গেল।

সে-দিনের পর থেকে কিন্তু পালিশ করা ভব্যতাকে ছিন্নভিন্ন করে' পাড়ার লোকের আসল রূপটি প্রকাশ পেতে লাগলো।

যে লোকটি গাড়ী করে' শাক-সব্জী আন্‌তো, জানা গেল এ বাড়ীতে সে আর জিনিসপত্র বিক্রী করবে না। ধোপা কাপড় দিয়ে গেল, কিন্তু দামও নিল না, কাপড়ও আর নিয়ে গেল না। দুধওয়ালা আর দুধ দেয় না। মুদি জিনিসপত্র বন্ধ করেছে। এমনি করে' সমস্ত মহাজনগুলি একে একে যতীনকে পরিত্যাগ করে' চলে' গেল।

একটা চাকর বাসন মেজে দিত, কিন্তু কাল মাইনে নিয়ে যাবার পর থেকে আর তার দেখা নেই। হিন্দুস্থানী ঝিয়ের শরীর খারাপ—সে বাড়ী যেতে চায়, মাহিনা চুকিয়ে দাও।

শুধু তাই নয়, আশপাশের ছোট ছোট বাড়ীগুলি থেকে সময়ে-অসময়ে হাসি-টিট্‌কারি আসতে সুরু করেছে! পদ্মার কণ্ঠের বিদ্রূপাত্মক নকল করে' কে একজন আবার সঙ্গীত-চর্চ্চাও করে।

সরস্বতী সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে একদিন স্পষ্টই বললেন—পাড়ায় সব বিয়ের যুগ্যি ছেলে মেয়ে রয়েছে, এ ঢলানিপানা দেখলে তাদের মন কি ভাল থাকবে! গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়ানো উচিত!

বাড়ীর কর্ত্তারা সেদিন প্রকাশ্যে সভা করে' প্রস্তাব পাশ করলেন—আমরা বেশীদিন আর অশান্তি ভোগ করতে রাজী নই! এতকাল দিব্যি আরামে ছিলাম, আপদটা এসে আমাদের সমস্ত সুর লণ্ডভণ্ড করে' দিল! ওকে তাড়াতেই হবে!

পদ্মা সে কথা শুনে বল্‌ল—আমরা কি অশান্তির সৃষ্টি করছি?

যতীন বল্‌ল—নিশ্চয়ই, তুমি ইচ্ছামত স্বামী-নির্ব্বাচন করে' ঘর করবে, তার মানে তুমি ত দেশশুদ্ধ লোকের মনে আগুন লাগাতে পারো! তোমার আদর্শ থেকে ওরা আত্মরক্ষা করবে না?

পদ্মা খানিকক্ষণ পরে বল্‌ল—এর উত্তরে তুমি কি কেবল চুপ করেই থাকবে?

যতীন একটু হাস্‌ল; বল্‌ল—তুমি কি বল্‌তে চাও আমি গিয়ে ওদের বোঝাবো যে, ওগো না—বিয়ের চেয়ে প্রেম বড়, মন্ত্রের চেয়ে মিলন বড়?

তা কেন? তুমি গিয়ে বলবে যে আমরা অন্যায় করিনি!

কা'কে বল্‌ব?

কেন, ওদের?

সর্ব্বনাশ, তাহলে' আমার মাথায় একগাছি চুলও থাকবে মনে কর?

পদ্মা চুপ করে' রইল। যতীন তখন বল্‌ল—আর নয়, এ বন্দর থেকে নোঙর তুলে নিয়ে আমাদের আবার ভাসতে হবে পদ্মা।

নিয়তিই ওই মেয়েটাকে এখানে পাঠিয়েছিল,—কারো দোষ নেই,—ও কি, ইস্, বাইরে ছেলেটা অমন কেঁদে উঠলো কেন?

পদ্মা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে গিয়ে দেখে, ভোম্বল কাৎ হয়ে পড়ে চীৎকার করছে; কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে!

যতীনও বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইঁটের ঢেলা এসে তার পায়ের কাছে ছিট্‌কে পড়ল। গেল কাল থেকে এম্‌নি মাঝে মাঝে ইঁট-পাট্‌কেল এসে পড়ছিল বটে!

আঁচল দিয়ে পদ্মা ছেলের মাথার রক্ত মুছিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। পরে বিদীর্ণ কণ্ঠে স্বামীর দিকে চেয়ে বলে' উঠলো—এখনো চুপ করে' থাকবে? তুমি কি পাথর?

এতবড় আঘাত পেয়েও যতীন শুধু খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল। পরে ভারি গলায় মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে শুধু বল্‌ল—এ রকম অবস্থায় পড়া ত তোমার-আমার এই প্রথম নয়, পদ্মা? সেবার ভাগলপুরে গিয়ে কি হয়েছিল মনে নেই! সে ত এই এক বছরের কথা!

ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে পদ্মা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল!

*

* *

অবশেষে একদিন সকলের মিলিত অপমানে, জঘন্য বিদ্রূপে, কুৎসিত মন্তব্যে ও সহানুভূতিহীন অলজ্জ ব্যবহারে জর্জ্জরিত হয়ে যতীনকে এখানকার চাকরিটি ছাড়তে হল'।

মানুষের কাছে মানুষের যে একটি স্বাভাবিক পাওনা, এতদিন একসঙ্গে থাকার দরুণ অন্তরে অন্তরে যে একটি সহজ প্রীতির সঞ্চারণ—আজ নিতান্ত অকরুণের মত তারা সমস্তই অস্বীকার করল। সংস্কারের কাছে প্রেম ও মনুষ্যত্বকে তারা অকুণ্ঠায় অপমান করে' তাড়িয়ে দিল!

নিভৃত রাত্রে অসহায় দুটি নরনারী কণ্টক-শয্যার মধ্যে বোধ করি নিঃশব্দে অশ্রুত্যাগ করছিল, হঠাৎ জানলার কাছে টোকা পড়তেই পদ্মা বল্ল—কে?

মৃদু কণ্ঠস্বরে উত্তর এল—আমি, দরজাটা একবার খোল ত বৌদি?

তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে পদ্মা বলল—ললিতা, এত রাতে কেন ভাই? তুইও বুঝি এবার বাড়ী বয়ে' অপমান করতে এলি?—পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ললিতা চুপি চুপি ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তারপর বল্ল—শুতে যাচ্ছিলাম, লুকিয়ে তাই একবার···শুনলাম তোমরা কালকেই

চলে' যাবে! আমি একবার দেখা করতে এলাম বৌদি।—সেই ভালো, তোমরা আর এখানে থেকো না ভাই!

বলতে বলতে হেঁট হয়ে নির্ব্বাক পদ্মার পায়ের ধূলো ললিতা মাথায় তুলে নিল। পরে বল্ল—এবার যাই, কেউ হয়ত আবার··· যে সব লোক!

দু' পা গিয়ে আবার সে ফিরে এল। হেঁট হয়ে যতীনের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্ল—দাদা, আমি আপনার ছোট বোন, কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবু—তবু আমার মনে হয় আপনারা কোনো অন্যায় করেন নি!

ললিতা মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

মর্ম্মকামনা

পরিচয় ঃ সুন্দর ও মহৎ জীবনের পিপাসায় একটি নিপীড়িত নারীর ব্যাকুলতা—এই গল্পের ভাবরূপ।

গৃহস্থ ঘরে ছোট খাটো ব্যাপার—এমন ঘটেই থাকে। সংসার করতে গেলে এত সব খুঁটিনাটির দিকে নজর দিলে কি আর শান্তি থাকে!

—তোমরা যেন কী বাছা, তিন ঘর ভাড়াটে রয়েছে পাশে, ঘরের বউয়ের নিন্দে শাঁখ বাজিয়ে না বল্‌লে আর তোমাদের চলে না!

ছাদ থেকে গলা বাড়িয়ে যিনি হক্ কথা শোনালেন তিনিও ভাড়াটে। অনেকদিনের পুরোনো এবং মুরুব্বিয়ানার জোরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

নীচে তখনও চেঁচামেচির বিরাম নেই। একজনকে কেন্দ্র করে' কতকগুলি মেয়ে-পুরুষের বিকৃত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের অজস্র বর্ষণ চলছিল।

ননদের গলার আওয়াজটিই বেশি চড়ে। বল্‌ল—নিন্দে শুনে শুনে ত' বউয়ের তিন অঙ্গ ক্ষয়ে' গেল! তা বলে' ঘরের বউ চুরি করে' খাবে গা? তুমি কি বল পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা বলল—তাই কি আর বলি বাছা? তা বলি নে। ছোট মেয়ে, সারাদিন চরকির মতন ঘোরে, মুখে জলটুকু নেই; না বলে' মিছরি এক ড্যালা যদি গালে দিয়েই থাকে তাতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ—

গমগম করে' ননদ বলে' উঠলো—পোকা পড়বে, মুখ খসে'

যাবে। চুরি করে' যে খায় তার, ওকালতি যে করে তারও।—রাগের মুখে বাকি কথাটাও ভুল্‌লনা। বল্‌ল—রাঙা মূলো! রূপের অংখারে পা পড়ে না,—রূপ কি আর থাক্‌বে গা—

ছাদের আল্‌সে থেকে সরে' যাবার সময় পাঁচুর মা বলে' গেল—ননদের চোখে ভাজের রূপ চক্ষুশূল, এ বাছা চিরকেলে কথা!

ননদ আবার চেঁচিয়ে উঠলো—আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে; বলে, 'পর লাগে না পরে', নিজের চরকায় তুমি তেল দাও গে। আমাদের ছাগল আমরা ল্যাজে কাট্‌বো—তুমি যাও।

বাঁ-দিকে কাঠের বেড়ার ফুটো দিয়ে আর একটি তরুণী এতক্ষণ এদের কলহ শুনছিল—ছাগলের নাম শুনেই সে খিল্‌খিল্ করে' হেসে লুটোপুটি খেয়ে নিজের ঘরে চলে' গেল। মেয়েটি আইন-কলেজের একটি ছাত্রের স্ত্রী—নব্য বিবাহিতা। স্বামী-স্ত্রীতে দুটি ঘর ভাড়া করে' আছে। যুবকটি আইনও পড়ে—অধ্যাপনাও করে।

তা' রূপের অহঙ্কার থাকলে বেমানান হত' না। বছর বাইশ বয়সের বউটি এতক্ষণ সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এই জঘন্য কলহ শুনছিল।' জঘন্য বটে কিন্তু মিথ্যা নয়। হাতের মুঠায় আধখানা মিছরির খণ্ড তখনও রয়েছে। ক্রোধান্বিত তীব্র দৃষ্টিতে সে নিঃশব্দে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। মুখখানি যেন

ঠিক উদয়াস্তের সোনালি মেঘ। যেমনি ভাসা-ভাসা, তেমনি আরক্ত!

সিঁড়ি দিয়ে ননদ উঠ্‌ছিল। বল্‌ল—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

বউ বল্‌ল—খুসী! তোমার কি?

আ মর্‌! মুখ ছ্যাখো রাক্ষুসির। বলি মাছ কুটতে হবে না?

বউ নেমে যাচ্ছিল—খপ্‌ করে' তার গায়ের আঁচলটা ধরে' প্রবীণা ননদ বল্‌ল—বল্‌ তোকে বল্‌লেই হবে, চুরি করে' খেয়েছিস কি না বল্‌।

আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে মিছরির ডেলাটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বউ বলে' গেল—খেয়েছি বেশ করেছি, তোমার বরের পয়সায় ত খাই নি!

আবহাওয়াটাই মন্দ। দিন রাত এই অন্ধকার খুপরিতে থাকা; বাইরের আলো-হাওয়ার চলাচল নেই। এর ওপর নিন্দা কলহ ও কুসংস্কারের গ্লানিতে অবরুদ্ধ বাতাস মাঝে মাঝে পঙ্কিল হয়ে উঠে।

অতি বৃদ্ধা শাশুড়ী চোখে দেখতে পায় না—কিন্তু কান দুটো তা'র ভারি তীক্ষ্ণ। মুখখানা আবার তীক্ষ্ণতর। বলে—মরুক্‌, অমন বউ নিপাত যাক্‌—হে ভগবান!

কিন্তু বউয়ের সেবা নৈলে তা'র দিন চলা ভার!

ভাই-বোন দুজনেই পঞ্চাশের কোঠায়। দুজনেই এক জাতের। বোন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—দেখলে দাদা, তোমার একরত্তি বউয়ের রকম দেখলে?

দাদা বলে—হলো কি কাত্যায়নী?

কাত্যায়নী চোখে কাপড় ঘষে' বলে—বিধপা বলে' বীণা-বৌ যখন তখন আমায় খোঁটা দেয়। এমন করলে কোথায় যাই বল ত?

আরক্ত চোখে চেয়ে দাদা বলে—মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে হারাম-জাদির মুখখানা ভেঙে দিতে পারিস নে? মার-ধোর অনেকদিন না খেয়ে ভারি তেল হয়েছে—বুঝ্‌লি কাতু?

কাত্যায়নী বলে—কি জানি দাদা, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ—

গলা উঁচিয়ে দাদা বলে—তা বলে' আমি কাউকে রেয়াৎ করি নে। ভাল মানুষের মতন থাকো—বাপের ঠাকুর। নৈলে আমি—

তারপর যা বলে তা অন্তত সহোদর বোনের কাছে স্ত্রীর সম্বন্ধে বলা চলে না।

জাত কারবারি। তিসি আর সরষে পিষে তেল বা'র করে। সারা জীবন জেনেছে শুধু পেষণ। মানুষকে নিষ্পেষণ করতেও তার এতটুকু বাধে না। তা ছাড়া লোককে টাকা ধার দিয়ে সুদও খাটায়।—তেজারতি!

প্রথম পক্ষের তিনটে ছেলে-মেয়ে। একটা ছেলে দুশ্চরিত্র, আর একটা থিয়েটার করে' বেড়ায়। মেয়েটা আজও বেঁচে আছে বটে কিন্তু তার ইতিহাস বলতে গেলে লজ্জায় অপমানে কণ্টকিত হ'তে হয়।

তা হো'ক্। এতে বাপের কোনো দুঃখ নেই। বলে—যাক্ গে যাক্, বয়ে' গেল! খাওয়াবো কদ্দিন? চরে'-বরে' খা'ক গে যেখানে খুসি! বাপ বলে' ত আর মাথা বিক্রী করি নি?

কথা শুনে অবাক হওয়া বীণার অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রতিদিনের ছোটখাটো নীচতা, শাঠ্য, অন্যায়, স্বার্থপরতা, কুশ্রী হীনতা একেবারে যেন তার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে মন ও মস্তিষ্ক পঙ্গু করে' ফেলেছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটিও তথৈবচ। কি একটা ভয়ানক কারণে ক্রোধোন্মত্ত স্বামী সেদিন ঘরের মধ্যে গর্জ্জন করছিল। কাত্যায়নী কাছে বসে' বিনিয়ে বিনিয়ে এতক্ষণ কি বলছিল কে জানে। কেষ্টকান্ত—স্বামীর নাম—গলা বাড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে হুঙ্কার করে' বল্‌ল—ডাক্ দেখি, শুখেগর বেটিকে·ডাক একবার, ওপরে আসতে বল্,—বাপের নাম যদি ওর না ভুলিয়ে দিই ত আমার নাম···হারামজাদি ভাইবোনের নামে এমনি করে'—ছি ছি···

কিন্তু ডাকতে হল' না। পায়ের শব্দ করতে করতে বীণা ওপরেই উঠে আসছিলো। কিন্তু উঁকি মেরে তাকে দেখেই কি

একটা কাজের ছুতো ক'রে' কাত্যায়নী চট্ করে' ঘরের বা'র হয়ে এল। বল্‌ল—যাই, এখনও আহ্নিক করা হয় নি।

সিঁড়ির সঙ্কীর্ণ পথে পরস্পরের গা ঘেঁষা হতেই বীণা বল্‌ল—ভা'য়ের কানে এতক্ষণ আমার নামে বুঝি বীজমন্তর দেওয়া হচ্ছিল ?

কট্‌মট্ করে' তার দিকে একবার তাকিয়ে কাত্যায়নী নীচে নেমে গেল।

কেষ্টকান্তর গর্জ্জন একটু কম্‌লেও বিষ মরে নি। ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্য দিকে চেয়ে বীণা বল্‌ল—কেন ডাকা হচ্ছে শুনি ?

ঘাড় ফিরিয়ে কেষ্টকান্ত তার আপাদমস্তক একবার ভাল করে' দেখ্‌ল। পরে উচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—কেন জানো না ?

না।

কিন্তু তার এই ঘাড় দুলিয়ে 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা বিপ্লব ঘটে' গেল। ঘট্‌লো কেষ্টকান্তর মুখে-চোখে। মুখের সেই কদর্য্য ভঙ্গী আর চাহনির রুক্ষ কর্কশতার পরিবর্ত্তে যেন একটা লুব্ধ ও আবিষ্ট দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌লো। বীণার পরিপূর্ণ ও নিটোল দেহখানির প্রতি অলক্ষ্যে আর একবার দেখে নিয়ে সে বল্‌ল—আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে বুঝি তোমার ঘেন্না হয় ? দুষ্টু কোথাকার !

বীণা কোনো দিনই এসব কথার উত্তর দেয় না। একটুখানি গলা নামিয়ে একটু হেসে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—তুমি আমার কাছে

এসে দাঁড়ালেই তোমার ওপর আমার সব রাগ পড়ে' যায়।—কাতুর সঙ্গে রোজ রোজ এমন ঝগড়া হয় কেন ?

জানিনা ক'। এসব শোনবার সময় আমার নেই।

কথা বলতে গিয়েও মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে যেন তরঙ্গ খেলে যায়। যাবার পথটা একটুখানি আড়াল করে' দাঁড়িয়ে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—রাগলেই তোমাকে যেন বেশি ভাল দেখায়—কেন বল ত ?

বলতে বলতেই জানোয়ারের মত ক্ষুধাতুর দাঁত বা'র করে' সে হাসতে লাগলো। কিন্তু তার এই জঘন্য তোষামোদের অর্থ বীণার অপরিচিত নয়। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে সে বেরিয়ে আসছিল—

ওকি, ছাড়ো—ঢঙ্ করবার সময় এ নয়।—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে' গেল।

*

* *

বন্ধুত্বটা এক পক্ষ থেকেই যেন জমে' ওঠে বেশি—এবং ছাদে না উঠলে আর দেখাশুনোই হয় না। ঘুলঘুলির ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে চিত্রা বলে—একদিকে চেয়ে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকো কেন ভাই ?

বীণা তার মুখের দিকে তাকায় কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। সারা দিনের বোঝা বয়ে অবকাশের সময়টিতে বন্ধুত্বে আর রুচি

থাকে না। একটুখানি ক্লান্ত হাসি হাসবার চেষ্টা করে' বলে—এম্‌নি।

চিত্রার পরণে একখানি নতুন সৌখিন শাড়ী। গায়ে জরির কাজ করা গরদের ব্লাউস। কানে হীরের দুল দু'টি এই অবেলার আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে। হাতে হাল-ফ্যাসানের দুগাছি চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি। মুখের ওপর লাল রোদের আভা খেল্‌ছে।—সমবয়সী।

চিত্রা বলে—সবই ভাই শুনতে পাই, এমন শ্বশুরবাড়ী কোথাও দেখি নি।

কিন্তু সবটাই যে শ্বশুরবাড়ীর দোষ নয়—এ কথাও চিত্রা জানে। এ মেয়েটি যে চুরি করে, মিথ্যা ও অভব্য কথা বলে, গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করে—এ সমস্ত চিত্রার অবিদিত নয়। কিন্তু সমবয়সের বন্ধুত্ব কোনো বাধার অপেক্ষা রাখে না। বলে—দোষ সকলেরই আছে কিন্তু তাই জন্যে—না ভাই, আমার কিছু বলা উচিত নয়।

বন-হরিণীর মত চিত্রা একদিকে ছুটে পালায়।

তার সেই লীলায়িত গতিভঙ্গীর দিকে চুপ করে' তাকিয়ে বীণা কি ভাবে কে জানে! মেয়েটি প্রতি কথায় যেন একটি সুগন্ধের আভাস দিয়ে যায়। তার সেই সুসজ্জিত ঘরখানির দিকে বীণা তাকিয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে কয়েকখানি সুদৃশ্য ছবি, দুটি

মেহগনি কাঠের ঝক্‌ঝকে দেরাজ, প্রসাধনের টেবিল সংলগ্ন বড় একখানি আয়না, বিছানাগুলি ধবধবে পরিষ্কার,—সুশৃঙ্খল অন্যান্য কতকগুলি গৃহসজ্জা যেন সুনিবিড় মমতার মত ঘরখানিকে ঘিরে রয়েছে। দু'টি জীবনের ছন্দকে আশ্রয় করে' একটি অপূর্ব্ব ভাব-ব্যঞ্জনা ঘরখানির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাঙালের মত সেইদিকে চেয়ে চেয়ে কোন্ এক সময় বীণার চোখ দুটো যেন হিংসায় জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। বুকের ভিতর থেকে যেন একটা প্রচণ্ড আত্মদাহী অকারণ দীর্ঘশ্বাস সুকঠিন জ্বালা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

দিনের আলো তখন আর থাকে না। চিত্রার যুবক স্বামিটি সাড়াশব্দ করে' ওপরে উঠে আসে। সুন্দর যুবকটির চোখে মুখে যেমন তারুণ্য, তেমনি যৌবনের পুলকোচ্ছ্বাস। অকারণে হো হো করে হাসে, প্রচুর কথাবার্ত্তা বলে, নিজেই হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে লোককে গান শোনায়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করে, অপরিমিত পরিশ্রম করতে পারে এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করে না।

এমন ভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় ভেবে বীণা চলে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু যেতে পারে না। দাঁড়িয়ে তাকে থাকতেই হয়। দেখে—সারাদিন বাদে স্বামিটি ফিরে এসে চিত্রাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে, তার দেহ এবং রূপসজ্জার প্রতি

তাকিয়ে বেশ সরস প্রশংসা করে, দেয়ালে টাঙানো কোন্ এক বিদেশী শিল্পীর আঁকা একখানি চিত্রের সঙ্গে চিত্রার তুলনা করে' তাকে রাগায়, প্রতিদিনের মত বেড়াতে যাবার লোভ দেখিয়ে স্ত্রীর কাছে আবার একটু তিরস্কারও শুনে নেয়।

ছোটখাটো দৃশ্য, কিন্তু সব জড়িয়ে এ যে কতখানি তার হয় ত সীমা নেই। কি যেন একটা ভয়ানক হৃদয়াবেগে বীণার গলা বুজে আসে।

খানিক পরে স্বামিটি বাইরে যায়—মুখ-হাত ধুয়ে আসে। চিত্রা খাবার এনে সযত্নে খাওয়ায়। পরে বারান্দার ধারে বসে' প্রতিদিনের মতই অবসান দিনের পাণ্ডুর আভাসের দিকে চেয়ে চেয়ে দুটিতে কি যেন প্রার্থনা করে। দুজনের মুখেই স্তবগানের মৃদুগুঞ্জন শোনা যায়।

আকাশে তখন প্রথম সন্ধ্যা-তারাটি ঝক্‌ঝক্ করে।

এতক্ষণে বীণার সেই ঈর্ষা-জর্জ্জর দুটি চোখে হু হু করে' জল এসে পড়ে। অন্ধদৃষ্টিতে হাতড়াতে হাতড়াতে তখন সে নীচে নেমে আসে।

আসে বটে কিন্তু ভাল লাগে না। গোধূলি-মলিন মুমূর্ষু আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে ওদের ঐ প্রার্থনা কা'র কাছে চলেছে! অনেক রকমে সে ভাববার চেষ্টা করে কিন্তু তার সেই চিন্তারই ফাঁকে ফাঁকে যুবকটির উচ্চ হাসি আর

অসংলগ্ন কথাগুলি ধারালো কাঁটার মত তার ভিতরে গিয়ে বিঁধ্‌তে থাকে।

দোকান থেকে দুপুর বেলা ফিরে এসে কেষ্টকান্ত হিসাব-নিকাশ করছিল। দিনে-রাতে বারকয়েক তহবিল না মিলিয়ে দেখলে তার ঘুম হয় না। জমা-খরচের খাতার সঙ্গে তহবিলের সামঞ্জস্য না দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার সব গোলমাল হয়ে গেল।

পাশের ঘরে বসে' কাত্যায়নী তখন তার সখের বানেশ্বর শিব-লিঙ্গের সেবায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ভায়ের অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ শুনে বলে' উঠলো—কি হলো কি দাদা?

দাদা বল্‌ল—শিগগির আয়—সর্ব্বনাশ।

কাত্যায়নী ছুটে এসে দেখল, উন্মাদ হয়ে যেতে কেষ্টকান্তর আর বিলম্ব নেই। পরণের কাপড় চোপড়ের অবস্থার দিকে আর চেয়ে থাকা চলে না। বিকৃত কণ্ঠে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—তবিল চুরি হয়ে গেছে কাতু, কে করলে?

ওঃ—এই কথা! আমি বলি কি না কি।

কে করলে?

কে করলে? তুমি কি ন্যাকা?—পরে ঠোঁট উল্টে একটু হেসে কাত্যায়নী পুনরায় বল্‌ল—বোধ হয় আমিই করেছি দাদা।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কেষ্টকান্ত এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' থেকে বল্‌ল—কিন্তু বৌ ত' কোনদিন টাকা চুরি করে নি কাতু?

মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে অকস্মাৎ কাত্যায়নী বলে' উঠলো—তবে আমিই করেছি, এই ত তোমার বিশ্বাস? তা আমায় জেলে দিও? —ফর্‌ফর্‌ করে' সে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাড়ীতে সেদিন একটা মহা হৈ চৈ পড়ে' গেল।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—সত্যি বলছিস কাতু, বৌ নিয়েছে?

কাত্যায়নী বল্‌ল—আর কি শিব ছুঁয়ে বলবো দাদা? মরণ হলেই বাঁচি।

ততক্ষণে কেষ্টকান্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। বীণা তখন অকর্ম্মণ্য শাশুড়ীর মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দিচ্ছিল। আর কোনো কথা নয়—কেষ্টকান্ত এসেই তার চুলের মুঠি ধরে' হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে বল্‌ল—ওপরে আয়।

কেন, কি—আঃ ছাড়ো লাগছে—বাবারে—

স্বামী ততক্ষণে টান্‌তে টান্‌তে ওপরে তুলে এনেছে। ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে' বল্‌ল—টাকা চুরি করেছিস কেন?

বাঘের মত তখন কেষ্টকান্তর চোখ দুটো জ্বল্‌ছে।

অবাক হয়ে বীণা বল্‌ল—টাকা? আমি নিয়েছি? সে কি?

ঠাস্‌ করে' গালে একটা চড় মেরে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—আবার

মিথ্যে কথা? হারামজাদি—ছেনাল! টাকা বার করে' দে নৈলে খুন করবো।

এক চড়েতেই চোখে জল এসেছিল। বীণা বল্‌ল—মাইরি আমি নিই নি, তোমার দিব্যি করে' বলছি, আমি কোনোদিন—

আবার চড়। চড়ের পর চাপড়। তদুপরি কিল এবং পুরুষোচিত ঘুসি। বীণা চীৎকার করে' উঠলো।

কিন্তু বাইশ বছরের যুবতীকে কাবু করতে হলে'...হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে! সেই আদিম কাল থেকে পুরুষের কাছে নারী-জাতি যে সম্মান-চিহ্ন পেয়ে এসেছে—পদাঘাত! পদাঘাতের পরেই পতন। কিন্তু মূর্চ্ছা নয়! চীৎকার করবার শক্তিও আর নেই—পেটে যে ব্যথা ধরেছে।

তা ধরুক—গলার আওয়াজ এখনও আছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে' অবরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বল্‌ল—বড্ড লেগেছে, উঃ—আর না, তোমার দিব্যি করে' বলছি আমি চুরি করি নি,—এই তোমার পা ছুঁয়ে—হাত বাড়িয়ে সে কেষ্টকান্তর একটা পা জড়িয়ে ধরে' আবার বল্‌ল—নিলে এতক্ষণ আমি ফেরৎ দিতাম সত্যি বলছি তোমাকে—।

দরজা ঠেলে সবেগে কাত্যায়নীর প্রবেশ। বল্‌ল—নিসনি? এত মার খেয়ে আবার মিথ্যেকথা? ছেলে যদি তোর থাকতো তবে তার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করাতাম। টাকা নিয়ে

ভায়ের হাত দিয়ে তুই বাপের বাড়ী পাঠাস নি? চল্ দেখি আমার বানেশ্বর ছুঁয়ে বল্‌বি?

চল।—আস্তে আস্তে বীণা উঠে এ ঘরে এল। ক্লান্ত হয়ে কেষ্টকান্ত তখন দরজার কাছে বসে' পড়েছে।

সিংহাসনের ওপর থেকে শিবলিঙ্গটি হঠাৎ হাতে করে' তুলে এনে বীণা সজল চোখে বল্‌ল—নিই নি নিই নি,—চুরি আমি করি নি—হল'?

তারপর শিবটি যথাস্থানে ছুঁড়ে দিয়ে ননদের দিকে একবার চেয়ে কি যেন বলতে গেল কিন্তু অশ্রুতে তার চোখ দুটি তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

ভাই বোনেই যেন এতক্ষণ মূর্চ্ছা গিয়েছিল। ঘোর কাটবার পর কাত্যায়নী বল্‌ল—কালকেই আমার দেওরের কাছে আমায় পাঠিয়ে দিও দাদা।

দাদা শুধু বল্‌ল—এতদিন যাবো যাবো কচ্ছিলে, এবার সত্যিই যেও ভাই।

* *
*

চিত্রা সবই শুন্‌তে পেয়েছিল। পাছে মুখোমুখি হলে' বীণা লজ্জিত হয়—এজন্যে সুমুখে আসতে সে নিজেই লজ্জা বোধ কচ্ছিল।

ছাদের পাঁচিলের কাছেই বীণা দাঁড়িয়েছিল। চিত্রাকে ডেকে বল্‌ল—শোনো না! দু'তিনদিন দেখিনি যে?

কাছে এসে ওপাশে দাঁড়িয়ে চিত্রা বল্‌ল—ওঁর ছুটি ছিল কি না, তাই জন্যে ভাই সময় পাই না।

ও। আচ্ছা, একটা কথা তোমায় বলছিলাম।

একটু হেসে চিত্রা বল্‌ল—বল না ভাই?

বীণা বল্‌ল—সেদিন তুমি চমৎকার শাড়ীখানি পরেছিলে। ব্লাউসটিও তেমনি। তোমার কানের ওই দুল দুটোর অনেক দাম—না?

চিত্রা বল্‌ল—খুব বেশি নয়।

আচ্ছা যে এসেন্স্‌টা মেখেছিলে সেটা গোলাপের বোধ হয়, না রজনীগন্ধার? ভাল পাউডার আর পমেটমও তুমি মাখো—না?

চিত্রা কি একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রসিকতা করা উচিত হবে না ভেবে চুপ করে' গেল!

তাই বলছিলাম, আচ্ছা, ওইগুলো আমায় আনিয়ে দিতে পারো ভাই?

কি?

ওই রকম শাড়ী, ব্লাউস আর দুল। আর সেদিন মুখে তুমি যা যা মেখেছিলে! এই নাও ভাই, তোমার স্বামী যেন দয়া করে' এনে দেন্।—বলেই সেই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে খানকয়েক

টাকার নোট চিত্রার হাতে গুঁজে দিয়েই বীণা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। এমন ভাবে হাঁপাচ্ছিল যেন সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে।

পরদিন ঠিক সেই সময়টিতে দুজনে আবার দেখা। চিত্রা একটু হেসে বল্‌ল—তোমার ফর্দ্দ মতই সবগুলি এসেছে ভাই, কিছুই ত্রুটি হয় নি।—বলে' খবরের কাগজের একটা বাঁধা মোড়ক সে বীণার হাতে তুলে দিল।

চিত্রার স্বামীটি বোধ হয় বেরোচ্ছিল, হঠাৎ চোখোচোখি হতেই মৃদু হেসে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল—এবার যখন যা দরকার হবে বলে' পাঠাবেন, এনে দেবো।

চিত্রা বল্‌ল—আর কি! এবার থেকে তাহলে—বলে' হাসতে হাসতে সে ছুটে পালালো।

মোড়কটা হাতে নিয়ে বীণাও নীচে নেমে এল।

ঘরের মধ্যে বসে' আলোটা জ্বেলে মোড়কটা খুলে দেখতে দেখতে সে চম্‌কে উঠলো। শাড়ীর একটা ভাঁজের মধ্যে সেই নোট ক'খানা আবার ফিরে এসেছে!

একথা কাউকে বলবার নয়। ফেরৎ দেওয়ার পথটুকু ধরে' কত বড় অনুগ্রহ যে আজ এসেছে তার আর সীমা নেই। দয়াও যেমন নির্দ্দয়তাও তেমনি। ঘৃণা ও করুণা, অবহেলা ও যত্ন যেন এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। এ কি বন্ধুত্বের পুরস্কার, না

করুণার দান? মনে পড়ে' গেল যুবকটির সস্নেহ মৃদু হাসি, চোখ দুটির সরলতা, কথা বলবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী,—সমস্ত মিলে তার জর্জ্জরিত বুকের মধ্যে ধারাল ছুরির মত কাটতে লাগলো। তার ভদ্রতা, মহত্ত্ব এবং বিনয় যেন অপাত্রে পড়ে' বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।—রাগে এবং ঘৃণায় সে বসে' বসে' কাঁপতে লাগলো। ভগবানের প্রতি শয়তানের যেমন ক্ষুব্ধ আক্রোশ!

*

* *

রাতের বেলা পাশে শুয়ে কেষ্টকান্ত বল্‌ল—কেন খামোকা চোখের জল ফেল্‌চ?

হঠাৎ বীণার মাথায় যেন ভূত চেপে গেল। চোখ মুছে উঠে বসে' বল্‌ল—কেন তা তুমি কি জানবে? কোন্ খবরটা রাখো শুনি?

কি হল' কি?

কিছুই না! আমাকে লোকে যদি অপমান করে তাতে তোমার আর কি!

অপমান? কে করলে? কাতু ত চলে' গেছে!

কাতু ছাড়া কি পৃথিবীতে অপমান করবার লোক নাই?

কেষ্টকান্তও উঠে বসলো। বল্‌ল—তবে?

বীণা একটুখানি চুপ করে' রইলো। পরে বল্‌ল—ও যে ভাল লোক নয় এ আমি আগে থেকেই জানি।

কে ?

ওই যে ওপাশের সুরেনটা! বদ্‌মাইস লোক! একলা ছাদে গিছলাম, অত এদিক ওদিক দেখি নি। ও এসে ওদিক থেকে কি সব বলতে লাগলো, ছুটে পালিয়ে এলাম তাই—। বীণা একটুখানি থেমে আবার বল্‌ল—বলতে গেলে এখন অনেক কথা। ওই ছুঁড়িটাই কি কম? ও ত' বেরিয়ে এসেছে ওই লোকটার সঙ্গে। ছেনালী করে' আবার সিঁদুর পরা হয়!

কেষ্টকান্ত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে বল্‌ল—কিন্তু ওকে যে ভালো ছেলে বলেই জানি।

ভালো সবাই, আমিই শুধু মন্দ—এই ত? তা বেশ, আর যদি কোনাদন কোনো কথা বলি তাহলে'—

হিংসা-জর্জ্জর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেষ্টকান্ত চুপ করে' বসে' রইল। মনে হল' আগুনের একটা শিখা তা'র নাড়িতে নাড়িতে পাক খেয়ে রি রি করে' জ্বল্‌ছে।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠেই সকল কাজের আগে কেষ্টকান্ত বাইরে গেল। গম্ভীর ভাবে ছোকরাটিকে ডেকে বল্‌ল—তোমাকে একটি কথা বলেছিলাম, সুরেন ভায়া।

সুরেন বল্‌ল—বেশ ত বলুন না ?

গলা পরিষ্কার করে' কেষ্টকান্ত বল্‌ল—দু' একদিনের মধ্যে আমার ভাই পো এখানে আসছে, তার থাকবার মতন ঘর ত আর নেই। তা তুমি যদি ভায়া—

বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে নাকি ?

হেঁ হেঁ, বুদ্ধিমান ছেলে,—বুঝতে পেরেছ দেখছি।

সুরেন হেসে বল্‌ল—বুঝতে পেরেছি অনেক দিন আগেই। আপনি সেদিনও চেঁচিয়ে কি একটা কথা বলেছিলেন।—সুরেন আবার হাসলো, হেসে বল্‌ল—বেশ, তাই যাবো। যদিও এত তাড়াতাড়ি না গেলে আপনি কিছুই কর্‌তে পারেন না।

কালকেই যাবে কি ভায়া ? না পরশু ?

সুরেন আবার হাসলো। বল্‌ল—না, কাল নয়, ওবেলায়ই যাবো। এর পর রাত্রিবাসও আর করবো না। আমি সত্যিই একটু বুদ্ধিমান—বুঝলেন দাদা ?

কিছু মনে করো না ভায়া, নিতান্ত দায়ে পড়েই—মাথা হেঁট করে' কেষ্টকান্ত ভিতরে গেল।

যাবার সময় চিত্রা একবার বীণার সঙ্গে দেখা করতে চাইল—হল' না। হয়তো বলতো—ভাই, তোমার কুৎসিত জীবন সুন্দর হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

স্বামীটি হয়ত বলতো—দেবি, আপনার সতীত্বের পায়ে প্রণাম জানাচ্ছি।

কিন্তু ওরা যখন চলে' গেল বীণা তখন কোথায়? বীণা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে' জান্‌লার সম্মুখে চুল বাঁধতে বসেছে। কোলের কাছে খোলা একখানি আয়না। আয়নার ভিতরে তার মুখের পাশে আসন্ন সন্ধ্যার আকাশের এক টুক্‌রো প্রতিফলিত হয়েছে।

সে বিস্মিত হয়ে দেখলো তা'র চোখের জল দু'টি ধারায় গালের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে! কেন? ভদ্র দু'টি নর-নারীর নামে মিথ্যা দুর্নাম দিয়েছে,—এ অশ্রু কি সেই কারণে? সুন্দর ও আদর্শ জীবনের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক আক্রোশ কেন? জীবনে তার পরম প্রয়োজন কী? কী সে পায় নি?

তার চোখের জল ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল আয়নার ওপর। সে জলে আয়নার ভিতরের আকাশ হ'ল সিক্ত।

কঙ্কাল

পরিচয় ঃ পূর্ব্ব পুরুষ ছিল বনেদী, এ পুরুষে তার অবশেষ কতটুকু আছে এবং কতটুকু নেই—তাই এ গল্পের অবলম্বন।

প্রথম পুরুষ ছিল জমিদার। জমিদার বলতে তার পুরো অর্থ যা বোঝায়। ক্ষেত-খামার চাষ-বাস, গোয়ালে গরু, গোলায় ধান, বাগানে শাক-সব্জী, পুকুরে মাছ। এর ওপর ছিল তালুকের খাজনা, অস্থাবর সম্পত্তি এবং জমা টাকা। সংসারে অভাব-অনটনের নাম-গন্ধও ছিল না! সুখের ঘর।

বাঘে-গরুতে জল এক সাথে না খেলেও লোক-প্রশংসায় চারিদিক ছিল মুখর। বামুন-বোষ্টমের পাত পড়তো, দান-খয়রাৎ ছিল অজস্র, বারো মাসে তেরোটি পার্ব্বণের ভিড় লেগেই থাকতো!

· প্রথম পুরুষ কাটে সগৌরবে।

একদিন সেই বংশের ছেলের হলো সহরে যাবার সাধ। কালের হাওয়াকে দ্বিতীয় পুরুষ এড়াতে পারল না।

সহরের মাটিতে তার পাকা ভিত বস্‌লো। ইংরেজি লেখাপড়া শিখে সভ্য-সমাজে মেলা-মেশা সুরু হয়ে গেল। সহরের যে আদব-কায়দা, মৌখিক ভদ্রতা, রীতি-নীতি, রুচি, কেতাদুরস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ—তার আবহাওয়ায় পাড়াগাঁয়ের মানুষ নিশ্বাস নিতে লাগল।

ঘরে জল্‌লো বিজলীর আলো, মাথায় ঘুরলো বিদ্যুতের পাখা, কাচের গেলাসে খে'ল কলের জল, ভ্রমণের বাহন হল'হাওয়া-গাড়ী।

কল্‌সির জল গড়াতে গড়াতেই ফুরোয়। আয় নেই, ব্যয়

আছে। দ্বিতীয় পুরুষের হাতে ঐশ্বর্য্য উড়ে' যেতে লাগল ধূলোর মত।

পাল-পার্ব্বণ একটু একটু করে' বন্ধ হল, পাঁচজনকে দান-খয়রাৎ করা আর চল্‌লো না, চাষবাসে আগেই এসেছে অরুচি, পাড়াগাঁয়ের একঘেয়ে জীবনে ফিরে যেতে কি আর কেউ চায়?

এই হলো ভূমিকা!

*

* *

তারপর তৃতীয় পুরুষ।

জমিদার ও জমিদারী এখন স্বপ্নবৎ। দুটোই ভেঙে ভেঙে এখন একটি ছোট্ট সংসারে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের বলতে এখন আর কিছুই নেই।

সহরের এক সঙ্কীর্ণ পল্লীতে অতীত এবং পতিত জমিদার-বংশ ঘর ভাড়া করে' থাকে। অতি কষ্টে দিন চলে!

বামুন-পণ্ডিতের ছেলে এখন আর জ্ঞানচর্চ্চার জন্য লেখাপড়া শেখে না,—মুখস্থ করে। জ্ঞানের প্রয়োজনও আর নেই, আহরণের সময়ও নেই। মুখস্থ করলে তবে একটি চাকুরি জুটবে।

কিন্তু চাকুরি একটি আর অবিনাশের কোথাও জুট্‌লো না।

বড় ভাই সদাগরী আপিসে কাজ করে। তাইতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে কিনা সন্দেহ। দারিদ্র্য ঢুকে ছোট্ট সংসারটিকে শ্রীহীন করেছে। নিত্য অভাবের ফিরিস্তি নিরুপায়ের মত শুনে যেতে হয়। বড় বংশের নামটা ভাঙিয়ে পরিচয়টা চলে কিন্তু সহরের খরচ চলে না।

অথচ সভ্যতার কাঠামোটা বজায় রাখতে চেষ্টার আর ত্রুটি নেই।

—'ও কি হল'? বার বার কাপড়ে সাবান দিচ্ছিস, রঙ খুল্‌বে কেন?

অবিনাশ একটু হেসে বল্‌লে—ফর্সা করা চাই ত!

হরিহর বল্‌ল—ফর্সা করা চাই! এদিকে যে ছেঁড়া কুটি কুটি! ও-কাপড় কি আর পরা চল্‌বে?

অবিনাশ বল্‌ল—কোঁচার দিকে রেখে ঢেকে পরবো'খন। তাঁতের কাপড় যে!

হরিহর খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বল্‌ল—জামা বুঝি তোর নেই অবিনাশ?

লজ্জার হাসি হেসে মুখ লাল করে' অবিনাশ বল্‌ল—সেই সেবার পূজোর দরুণ একটা মট্‌কার জামা ছিল, তাই চল্‌ছে।—বলে' নিজের মনেই সে আবার কাপড়ে সাবান ঘষ্‌তে লাগল।

বড় ভাইকে বিবাহ করতে হয়েছে,—কিন্তু যে পরিমাণ আয়,

তাতে স্ত্রীকে আর বাপের বাড়ী থেকে আনা চলে না। হরিহর মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ী যায়।

বেকার অবিনাশের হাত-খরচ চলে অতি কষ্টে। চার আনার বাজার করতে গেলে অন্ততঃ তিনটি পয়সা তাকে বাঁ-দিকের ট্যাঁকে সরিয়ে রাখতেই হয়। মুদীর দোকানের হিসেব মেলাতে গিয়ে চার আনা আট আনা গোঁজামিল না দিলেই চলে না। চুল ছাঁটার পয়সা আদায় করে' নিয়ে বাড়ীতেই সে লুকিয়ে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে চুল কাটে। সেবার অসুখে পড়ে' দিন কয়েক গয়লার দুধ খেতে হয়েছিল, কিন্তু তার পয়সা শোধ করবার সময়ে অবিনাশ ধরে' বস্‌ল, দুধে জল মেশানো ছিল অত্যধিক পরিমাণে, দাম সে কাট্‌বেই।

গয়লা যাবার সময় যে গালাগালটা দিয়ে গেল, অবিনাশ সেটা নিঃশব্দেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌লো।—সাদা দুধ খেয়ে যে দাম দেয় না, তার গায়ে সাদা রোগ বেরোয়।

এম্‌নি করে' এই বনেদী বংশের ছেলেটির জীবনে যে ছোট ছোট ত্রুটিগুলি প্রবেশ করেছিল তাকে আর কোনক্রমেই গোপন করা চলে না। রক্ত দূষিত হলে মাঝে মাঝে ঘা ফুটে বেরোয়।

এই দারিদ্র্যগ্রস্ত গৃহস্থটির সংসারে পূর্ব্ব-মহত্ত্বের এক-আধখানি কঙ্কাল মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হতো। মেহগনি কাঠের আলমারীটা

জীর্ণ অবস্থায় পড়ে' থেকে পোকামাকড় ও আরশোলার বাসস্থান হয়েছে। আগে এটিতে বই ঠাসা ছিল কিন্তু সেগুলি সমস্তই গেছে পুরাতন পুস্তকের দোকানে। ছেঁড়া গদি-আঁটা সোফার মর্‌চে-ধরা স্প্রীংটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে মহাকালের ইচ্ছার স্বপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে। চীনে মাটির দু' একটা ফ্যান্সী পুতুলের কবন্ধ-দেহ আজও কোথাও কোথাও গড়াগড়ি অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর কৌটোয় সিঁদুরটুকুই আছে কিন্তু সিঁদুর মাখা টাকাগুলি গেছে কবে কোন্ মুদীর দোকানের হিসাব শোধ করতে। ভাঙা এক-আধটা আলোর শেজ, শাল ও মখমলের ছেঁড়া চাপকানের টুকুরো, ঝাড়ের পরকলা, একপাটি জীর্ণ জরির জুতো—এরাও অন্ধকারের ভিতর থেকে করুণ নেত্রে মুখ বাড়িয়ে অতীত-ইতিহাসের কথা জানাতে কসুর করে না।

সকাল বেলা একদিন একটি লোক অবিনাশকে ডাকতে এল। এ সময়টা সবাই বাড়ীতে থাকে।

ডাকতেই হরিহর এল বেরিয়ে,—কা'কে চান্?

—অবিনাশ বাবু বলে' কেউ থাকেন এ পাড়ায়? অবিনাশ চৌধুরী। কদিন ধরে' তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মশাই, বিশেষ—

হরিহর বল্‌ল—কি দরকার?

—দরকার! তা আপনাকে কেনই বা বলব না বলুন। বলে' লোকটি একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে' বল্‌ল—ওই যে বড়

গেট্অলা বাড়ীটা দেখছেন রাস্তার মোড়ে, জানতাম ওখানেই তিনি থাকেন কিন্তু—

হরিহর তার মুখের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটু আধটু পরিচয়ও ছিল, তা বলে' বন্ধুত্ব নয়, বড়লোকের ছেলে অথচ কেমন গরিবানা চালে থাকেন, দেখে আমার ভারি শ্রদ্ধা হয়েছিল—

—ব্যাপারটা কি বলুন না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ বলি, অনেকটা তিনি এই আপনারই মতন দেখতে‥ …আর তা ছাড়া কি অপরাধ করেছি বলুন, লোকের অসময়ে টাকা ধার দেওয়াটা ত আর অন্যায় নয়। দিলাম অতি কষ্টে সঞ্চে-বঞ্চে তিরিশটি টাকা—বাস্, আর তাঁর দেখা নেই।

তারপর এই আর কি! জিজ্ঞেস করলাম ওখানে গিয়ে। বল্লে, এ বাড়ীতে অবিনাশ বলে' কেউ নেই! সে কি কথা। এত বড় জমিদারের ছেলে, এত বড় পরিচয়, তাঁর কথা কি আর অবিশ্বাস করা চলে? আপনিই বলুন না!

এখন কি করবেন?

খুঁজি! খুঁজতেই হবে! চায়ের দোকান দেবো বলে' টাকা জমিয়েছিলাম মশাই,……আমি বড় গরীব!

লোকটির চোখে জল না এলেও স্বরটা কেমন যেন গভীর হয়ে

উঠলো। শুধু বল্‌ল—জানেন এখানে অবিনাশ বাবু বলে' কেউ কোথাও থাকেন ?

হরিহর শুধু বল্‌ল—না! দেখুন ওই রাস্তায় কোথাও যদি—

লোকটি নমস্কার করে' চলে' গেল।

বন্ধুরা প্রায়ই আসে। অবিনাশের বন্ধু-ভাগ্য খুব।

বলে—তোমার এই বাইরের ঘরটি বেশ অবিনাশ! ছবিগুলোর অনেক দাম।

চীনে-বাজার থেকে ছবিগুলি কিনে এনে অবিনাশ ঘর সাজিয়েছে। বলে—ও আর এমন কি ভাই। বাবা যা খুদ-কুঁড়ো রেখে গেছেন তাই,—ও ছবিখানা আনা হয়েছিল প্যারিসের একজিবিশন্ থেকে। নিলামে কেনা, হাজার আড়াই টাকা মাত্র লেগেছিল।

চক্ষু বিস্ফারিত করে' বন্ধু বলে—আড়াই হাজার? আড়াই হাজারে একখানি ছবি? উঃ, সে কি কম টাকা হে!

অবিনাশ সলজ্জ একটু হেসে চুপ করে' যায়।

অবনী বলে—চা খাওয়াও অবিনাশ, তোমার বাড়ীতে এসে অমনি মুখে ফিরবো না। মেজাজ ত তোমার দিল্‌দরিয়া!

অবিনাশ হঠাৎ বলে' উঠ্‌লো—ওই যা, ছি ছি, দাদা বেরিয়ে

গেলেন একটু আগে, যদি চাবিটা ভাই নিয়ে রাখতাম! আমার মতন অসাবধান আর দুনিয়ায় নেই!

কেন, কি হল'?

আর ভাই, সমস্তই ভাঁড়ার ঘরে। ষ্টোরের চাবিটা দাদার কাছেই থাকে কি না!

চল তবে দোকানে গিয়ে খাওয়াবে চল।

অবিনাশ যেন হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়্‌ল। বল্‌ল— নন্‌সেন্স্! যে-বংশের একটু প্রেষ্টিজ্ আছে তাদের বাড়ীর ছেলে কক্ষণো নিজের কাছে পয়সা-কড়ি রাখে না। ওটা ডিগ্‌নিটিতে লাগে, জানিস্ না বুঝি?

ক্ষুধাতুর বন্ধু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে' গেল। বনেদী বংশের কায়দা-কানুন তার বোধ করি জানা ছিল না। দরিদ্র সে।

এমনি করে' শাঠ্য ও দৈন্য যেমন অবিনাশকে ধীরে ধীরে অধিকার করেছিল, দিনও কাট্‌তো তার তেমনি নানা মিথ্যার আবরণে নিজেকে ঢেকে। ভাণ, ভাবন, ভণিতা এরাই হল' তার সম্বল। উচ্ছে ভেজে তাকে পটল বলে' চালিয়ে দিতে সে এতটুকু দ্বিধা করে না।

অথচ এইটুকুই তার শেষ পরিচয় নয়। মাঝে মাঝে তার শিরার রক্তের মধ্যে একজন উচ্ছৃঙ্খল জমিদার নড়ে' চড়ে' বেড়াত।

নানা দৈন্য ও দুর্ব্বলতার ভিতরেও তার মন ভুল্‌তে পারত না যে সে এক বিশিষ্ট বনেদী বংশের সন্তান। তার দারিদ্র্য ছিল কিন্তু তাই বলে' তার ব্যয়-কুণ্ঠতা ছিল না। অভাবকে, অর্থ-হীনতার লজ্জাকে নানারূপ জোড়াতালি দিয়ে গোপন করে' নিজেকে ধনী বলে' চালাবার স্বাভাবিক স্পৃহা তার ছিল, কিন্তু একবার তার হাতে কিছু অর্থাগম হ'লেই সে পিতা এবং পিতা-মহকে অনুসরণ না করে' পারত না। একটা অসংযত অমিত-ব্যয়িতার নেশায় সে পথ থেকে যে-কোনো স্বল্প-পরিচিত অথবা যে-কোনো বন্ধুকে নিয়ে কোনো এক ভোজনাগারে কিম্বা প্রমোদাগারে বসে' যেত।

বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় তার উচ্চ আসন না থাকলেও একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। সবাই তাকে সমীহ করত কিন্তু এড়াতেও পারত না। যে-কোনো ব্যাপারের ওপর তার একটা টিকা-টিপ্পনীর জন্য সবাইকে তার মুখ চেয়ে থাকতে হত'। সে শান্ত এবং মৃদুস্বভাব হলেও নিজের অবস্থাটাকে কঠিন ভাবে স্পষ্ট করে' সবার মুখের ওপর জানিয়ে দেওয়াই ছিল তার অভ্যাস। সবার আগে গলা বাড়িয়ে নিজের ঐশ্বর্য্যের কথাটা বলে' দিয়ে তবে সে অন্য কথা পাড়বার অবকাশ দিত। অনেকের কানে এগুলো ফুট্‌লেও একটি ভীরু শ্রদ্ধা তাকে না দিয়ে কেউই থাকতে পারত না।

*
*　*

কিছুকাল পরে তার একটা মাষ্টারী জুটে গেল। এবার সে বাঁচ্‌ল। বলা বাহুল্য, মাষ্টারী সে গোপনেই করবে।

পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। মাইনে মাসে দশ টাকা। নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভাল!

ছেলেটির নাম—মদন। মদনের বাপের এক মদের দোকান আছে রাধাবাজারে। দোকানের অবস্থা আজ-কাল পিকেটিং-এর ব্যাপারে তেমন সুবিধে নয়।

মদন এখন ইংরেজি শিশুশিক্ষা পড়ে। অর্থাৎ, 'সেই সদা সত্য কথা বলিবে'; এবং 'পরের বস্তু কদাচ চুরি করিবে না!'

কিন্তু সে যাই হোক, দশটা টাকা অনেক টাকা। সংসারে অনটনের মধ্যে এই দশটা টাকা মাসিক আশীর্ব্বাদের মত এসে পড়ে। অবিনাশ পড়াতে যায় লুকিয়ে লুকিয়ে। কোনো একটা কিছু কাজের বদলে টাকা পাবো—এটার মধ্যে একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত অপমান আত্মগোপন করে' আছে, সে মনে করে। আভিজাত্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তার দুর্দ্দমনীয়!

কিন্তু পড়াতে লাগ্‌ল সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে'। হোক অপমান, হোক না কেন দুরবস্থার আনুসঙ্গিক—যথা সময়ের আগে এসে সে মদনকে পড়াতে বসে। শুঁড়ির ছেলেকে পড়াতে হচ্ছে

বলে' তার জাত্যাভিমানে আঘাত করলেও সে এ মনোবিকারকে আমল দিত না। টাকার প্রয়োজন তার অতিরিক্ত।

জীবনে অনেক গোঁজামিলই তাকে দিতে হতো! যতগুলি ছিদ্র ছিল তার চরিত্রের মধ্যে, সমস্তগুলিই তাকে ভরিয়ে তুলতে হতো নানারূপ কদর্য্য হৃদয়বৃত্তির জোড়াতালি দিয়ে। অন্যের কাছে সম্মান আদায় করতে সে ভালবাসত, তাই জন্যে নিজের প্রতি সম্মান দিতে হয় কেমন করে'—এ তাকে ভুলতে হয়েছিল।

একদিন কোনো একটি পরিচিত লোকের বাড়ী বিয়েতে সে গেল নিমন্ত্রণে। তার পরদিন সকালে হরিহর বাইরে যাবার আগে বল্‌ল—জুতো জোড়াটি ত চমৎকার! কত দিয়ে কিনেচিস্ রে? জুতো বুঝি তোর ছিল না অবিনাশ?

একটা ঢোক্ গিলে অবিনাশ বল্‌ল—নিয়েছে দশটাকা দাম।

ওই মাষ্টারীর টাকায়?

হঠাৎ অবিনাশ বল্‌ল—হ্যাঁ!

পুরোনো জুতোটা তোর গেল কোথায়? আমাকে দে, তবু পরে' পরে' বাজার-হাট করা চল্‌বে।

থতমত খেয়ে অবিনাশ বল্‌ল—পুরোনো জুতোটা নেই দাদা। ফেলে দিয়েছি।

হরিহর বল্‌ল—সে কি! তুই ত নষ্ট করবার ছেলে নয়! সেটা ত বেশ পরা চল্‌তো!

অবিনাশ সরে’ গেল সেখান থেকে। আড়ালে গিয়ে নিজের পায়ের দিকে একবার তাকাল। এ জুতোটা তার পায়ে একটু বড় হয় বটে! যাক্ গে।

একমাস পরে অবিনাশ একদিন বল্‌ল—মদন, তোমার বাবাকে আমার টাকাটা দিতে বলো।

মদন বল্‌ল—বাবা দিয়ে রেখেছেন, দাঁড়ান্ আপনাকে বের করে’ দিচ্ছি।—বলে’ সে উঠে গিয়ে তার ডেস্কটা খুল্‌লো।

খানিকক্ষণ এটা-ওটা কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করে’ বল্‌ল—নেই ত, এর মধ্যেই যে ছিল মাষ্টার মশাই!

তার বিবর্ণ কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বল্‌ল—কি হল’?

মদন বল্‌ল—দশ টাকার একখানা নোট……বাবা অনেক কষ্টে……এই কালকে রেখেছিলাম এর মধ্যে!

চুরি গেছে! ছি, ছি, করলে কি? ওখানে কি কখনো রাখে? যে-সে আস্‌ছে, খুল্‌ছে…কি হবে বল ত? টাকা ত আমার আজকেই চাই……কপাল, কপাল! এমন বরাৎ নৈলে কি আর…এখন তবে কি করবে?

অবিনাশ হাঁপাতে লাগ্‌ল।

কর্ত্তা শুনে বেরিয়ে এলেন। বল্‌লেন—তাইত’ মাষ্টার মশাই,

এই দুঃসময়ে ভারি বিপদে পড়লাম। এখন আমার দোকান এক রকম বন্ধই যাচ্ছে।—আর তা ছাড়া মদনকে কি দোষ দেবো বলুন, ছেলে মানুষ ত বটে!

অবিনাশ মাথা হেঁট করে' ভাবতে লাগল। চিন্তার যেন তার আর কুল-কিনারা নেই। শুধু বল্‌ল—আশ্চর্য্য!

কর্ত্তা খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন—দয়া করে' আজ একবার আমার দোকানে যাবেন, দেখি যদি কিছু কর্ত্তে পারি। সমস্ত মাস আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে পরিশ্রম করেছেন, সময় মত টাকা না পেলে কি আপনার চল্‌বে? কিছু মনে করবেন না, যদি আপনাকে একটু কষ্ট দিই।

কষ্ট আর কি!—বলতে বলতে অবিনাশ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে চলে' গেল।

দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারলে সে বাঁচে! চুরি করা বড় পাপ।

বিকাল বেলা দোকানে গিয়ে সে দাঁড়াল। কর্ত্তা ডেকে আদর করে' বসালেন। সমস্ত ঘরে প্রায় কড়িকাঠ পর্য্যন্ত বিলাতী মদের বোতল সাজানো। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে গেলে অবিনাশের সঙ্কোচ আসে কারণ কেউ দেখে ফেল্‌লে পৌত্তলিক বলে' তাচ্ছিল্য করতে পারে, কিন্তু মদের দোকানে ঢুকে সে আনন্দিতই হলো—এর মধ্যে একটি চমৎকার আভিজাত্য আছে। মদ খেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার মধ্যে একটি উঁচুদরের আনন্দ!

অনেকক্ষণ বসে' বসেও একটি খদ্দের সে দেখতে পেল না। জনকয়েক পাওনাদার এসে জটলা করে' চেঁচামেচি করছিল। কর্ত্তা লজ্জায় ঘৃণায় একবার মুখ তুলে বললেন—দেখছেন ত জাত-ব্যবসা, কিন্তু এ আর আমার ভাল লাগছে না। কদিন থেকে একটি টাকাও বিক্রি নেই। মদের দোকান বন্ধ করে' এবার ভাবছি কংগ্রেসে নাম লেখাবো। কি বলেন?

অবিনাশ একটু হাসল।

বিকাল ছেড়ে সন্ধ্যা হল'—টাকা পাবার কোনো আশা পাওয়া গেল না। আর একটু পরেই দোকান বন্ধ করতে হবে।

আম্‌তা আম্‌তা করে' কি একবার বলবার চেষ্টা করতেই কর্ত্তা তার মুখের দিকে তাকালেন।

অবিনাশ গলা পরিষ্কার করে' বল্‌ল—দাম কত এক-একটা বোতলের? ওই যে ওই চৌকো বোতলটার?

কর্ত্তা বললেন—ছ' টাকা বারো আনা!

ও, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

কি?

ধরুন যদি আমি-গোটা দুই বোতল বিক্রি করে'—

পারবেন? লুকিয়ে করতে হবে যে! আজ-কাল পিকেটিংএর দিনে অনেককেই এ রকম কর্ত্তে হয়। একটা কোনো মাতালকে যদি ধরতে পারেন তা হলেই—

দেখি কি হয়, কাগজ মুড়ে দিন্ আমার হাতে।

বোতল দুটি হাতে করে' নিয়ে সে রাস্তায় নাম্‌ল।

সহরের রাস্তায় তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

*

* *

আপিস থেকে ফিরে এই কিছুক্ষণ আগে হরিহর রান্না চড়িয়েছে। রান্নাটা তাকেই করতে হয়।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল'। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে।

আলোটা হাতে করে' বাইরে এসে হরিহর বল্‌ল—কে?

একটি লোক এগিয়ে এসে বল্‌ল—আপনি কি অবিনাশ চৌধুরীর দাদা?

কেন?

আমি আসছি পুলিশ আপিস থেকে। অবিনাশবাবু আছেন হাজতে।

হাজতে? কি রকম?

লোকটা বল্‌ল—ভারি অন্যায় করেছেন তিনি, লাইসেন্স নেই, লুকিয়ে একটা বস্তির ভেতর বিলিতি মদ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ·····

মদ? বস্তির ভেতর?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পয়সার জন্য মানুষ এর চেয়েও,—আপনি কি যাবেন তাঁকে জামিনে খালাস করে' আনতে?

আলোর দিকে তাকিয়ে হরিহর বল্‌ল—না!

হাজতে বসে' তিনি কিন্তু কাঁদছেন।

একটুখানি হেসে হরিহর বল্‌ল—তা হোক, আজ সেখানে তার থাকা দরকার।

লোকটি নমস্কার করে' চলে' গেল।

পথের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থেকে হরিহর ভিতরে এল। আজকের রাতে অবিনাশ আর ফিরবে না, দরজাটা সে ধীরে ধীরে বন্ধ করে' দিল। আলো হাতে সে যখন আবার রান্নাঘরে এসে ঢুক্‌লো, পোড়া তরকারীর ধোঁয়ায় ঘরটা তখন অন্ধকার। একা এই বাড়ীখানায় একটা যেন বুকচাপা নিশ্বাস গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে। নীচের তলায় একটি ভয়াবহ নির্জ্জনতার রূপ যেন হাঁ করে' আছে।

রাগ হলো না, ছোট ভাইটির প্রতি গভীর বিতৃষ্ণাও তার এল না বরং একটি অপরিসীম মমতায় ও সহানুভূতিতে হরিহরের দু'টি স্নেহাতুর চোখ জলে ভরে' এল। মনে হলো যে-অন্যায় ও যে-পাপ অবিনাশ আজ কর্‌ল, এতে তাকে দোষ দেওয়া ত চলে না! নিরপরাধ, নিরুপায়, নিরবলম্বন সন্তান যে-শাস্তি আজ মাথায় তুলে নিয়ে গেল—সে তার উচ্ছৃঙ্খল ও অসচ্চরিত্র পিতার অপরাধের, অমিতব্যয়ী ও অদূরদর্শী পিতামহের অন্যায়ের!

বাতাস দিল দোল

পরিচয় ঃ ভাড়াটে বাড়ী। ভাড়াটে আসে আর চলে' যায়। চলে' যায় একটী বিধবা কিশোরীর মনে দাগ কেটে কেটে। ভীরু মেয়েটির রোমাঞ্চ আবেগ—এই গল্পের বিষয়বস্তু।

সকাল থেকেই যাবার আয়োজন চল্‌ছিল ! স্থান যাদের নেই তাদের প্রায়ই স্থান-পরিবর্ত্তন করতে হয়।

আসন্ন-বিচ্ছেদের বিষণ্নতায় অপরিসর অন্ধকার ঘরখানির আবহাওয়া কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে। সহবাসী দুটি পরস্পর অপরিচিত গৃহস্থের মধ্যে এতকালের আলাপে একটি আত্মীয়তা ঘনিয়ে এসেছিল বলতে হবে বৈ কি।

এই একটু আগেও উভয়পক্ষের ভারাক্রান্ত অবসন্ন মনের ক্ষোভ ও বেদনা বারকয়েক প্রকাশ করা হয়ে গেছে, তবুও বিদায় নেবার সময় বড়-বৌয়ের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে' এল। একটি করুণ গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে' তিনি বললেন—মনেই ছিল না মা যে আমরা ভাড়াটে ! এতকাল একসঙ্গে ছিলাম, একটি উঁচু কথা কোনোদিন ওঠেনি। আপনার লোক যে পথেও মেলে একথা কি জান্‌তাম ?

বিচ্ছেদ-কাতর ও নিঃশব্দ ঘরগুলির মধ্যে তাঁর কথাগুলি যেন তলিয়ে গেল। চারিদিক এমনই ম্লান, আচ্ছন্ন এবং রুদ্ধ-নিশ্বাস।

ভাসুর-পো'টি বিদায়-সজ্জা করে' এতক্ষণ কল্‌তলার কাছে দাঁড়িয়েছিল—এবার অন্দরের দিকে একটু এগিয়ে গেল ; একবার এদিক-ওদিক তাকালো, পরে মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল—তোমার কোনো উপকার আমি করতে পারি নি, যাবার সময় কেবল এই কথাই আমার মনে হচ্ছে।

অল্পবয়সী একটি বিধবা মেয়ে এতক্ষণ থামের আড়ালে মাথা হেঁট করে' কি ভাবছিল কে জানে, ছেলেটির কথায় আচম্‌কা মুখ তুলে' চেয়ে মাথাটি তার আরও হেঁট হয়ে গেল। বোধ হয় কি একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঠোঁটদুটি কেঁপে আবার স্থির হয়ে রইল।

বিদায়ের বেলায় স্বল্পপরিচিতা বিধবা কিশোরীকে এর চেয়ে বেশি আর কি বলা চলে!

ছেলেটি কিয়ৎক্ষণ একটি অস্বস্তিকর নীরবতা কাটিয়ে শুক্‌নো একটুখানি হেসে বল্‌ল—কি বল্‌তে এসেছিলাম ভুলেই গেছি! থাকৃগে।

বেড়ার ওধারে বড়-বৌয়ের ক্ষোভ-প্রকাশ তখনও চল্‌ছে।

মন্দা ভয়ে ভয়ে ভিতরের দিকে আর একটুখানি সরে' গেল; সামান্য দু'চারদিন যৎসামান্য হাল্‌কা আলাপ তাদের হয়ে গেছে, কিন্তু এ-কথাটির উত্তর দেবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তার কিছুই ছিল না। শঙ্কাতুর দুটি বড় বড় চোখে সে একবার শুধু তাকালো।

যুবকটি বুঝলো, বুঝে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার ক'রে সহজভাবে বল্‌ল—দাদা কোথায় তোমার?

মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মন্দা বল্‌ল—নেই। বোধ হয়—

যাবার সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে,—

তারপর কোনো কথাই আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার সময় আর একবার ছেলেটি কেবল বল্‌ল—আলাপ ত রইল, কিন্তু দেখা বোধ হয় আর হবে না। আসি তাহ'লে—কেমন ?

বুকের সমস্ত রক্ত তোলপাড় ক'রে মন্দার শুধু একটি কথাই বেরিয়ে এল—আচ্ছা !—এবং পরমুহূর্ত্তেই আসন্ন অন্ধকারে সে মিশিয়ে গেল।

বড়-বৌ আর একবার এধারে এলেন। বল্‌লেন—এবার তবে আসি মা ?

পায়ের ধূলো নিয়ে ঘাড় নেড়ে মন্দা এবার সম্মতি জানাতেই বড়-বৌ ডান হাতে তার চিবুকটি তুলে ধরে' বল্‌লেন—আর একটি কথা বলে' যাই, তেরো বছর বয়েসে শাদা থান প'রে জাতটার মুখে আর কালি দিস্‌নে মা ; নরুন্‌পেড়ে ধুতি পরিস্, তবে যদি দূরে থেকেও বুক ধরতে পারি !

তারপর হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অবিচ্ছিন্ন অবসাদের ভার কাঁধে নিয়ে এক-একটি দিন আবার পার হয়ে চল্‌তে থাকে। ওদিকের ঘরগুলি খালিই প'ড়ে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ভাড়াটে নাকি আবার একঘর আসবে।

ফাঁকা ঘরগুলি যেন মন্দার মুক্তি-তীর্থ। সারাদিনের কাজের বন্ধন থেকে এক-একবার ছাড়া নিয়ে সে এই নির্জ্জন ঘরগুলিতে এসে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। কড়ি-কাঠের কোণে কয়েকটা চড়াই পাখী বাসা বেঁধেছে; তাদের সঙ্গে মন্দার গভীর বন্ধুত্ব। তাদের অবিশ্রান্ত কোলাহল শুন্‌তে শুন্‌তে তার নিজের অন্তরও সেই সঙ্গে কলগুঞ্জন ক'রে ওঠে। একটি কালো-সাদা রঙের বিড়াল প্রায়ই বেড়াতে আসে; খাদ্যাভাবের দৈন্য তার মুখে সর্ব্বদা যেন লেগেই আছে; চোখদুটি শান্ত ও আত্ম-সমাহিত; বৈষ্ণবদের মত মদালসও বলা যেতে পারে। বেচারি চিরকালই আশ্রয়হীন। গায়ে বড় বড় লোম—যেন রেশমের গোছা। লেজটি তুলে মন্দার পায়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সোহাগ জানায়।

—আচ্ছা রাণি, তোকে এত গালাগাল দেয়, তবু ওদের রান্নাঘরে ঢুকিস্ কেন বল্ ত?

—মেউ?

—একদিনও মার খাস নি, এই বাহাদুরি কচ্ছিস ত? কিন্তু ধরা পড়্‌লে মারা যাবি যে!—ওকি, তোমার নজর অত উঁচুতে কেন? ওরা কাঠি-কুটি দিয়ে দিব্যি ঘর বাঁধছে, তোমার ওদিকে চেয়ে অত হিংসে কি জন্যে?

মেউ!

মন্দা তখন হেসে বিড়ালটিকে কোলে তুলে নেয়। কাঁধে ফেলে আদর করে। বুকের ওপর চেপে ধরে' ঘুম পাড়ায়।

একজোড়া গোলা পায়রা সম্প্রতি কার্ণিশের তলায় একটু স্থান সঙ্কুলান ক'রে নিয়েছে। যখন-তখন তাদের কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যায়। মন্দা লুকিয়ে লুকিয়ে কার্ণিশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে এক চমৎকার ভঙ্গীতে তাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করতে থাকে। সন্ধ্যার সময় গোটা-দুই চাম্‌চিকে ছুটোছুটি করে—তাদের দেখলেই মন্দা ভয়ে ভয়ে অন্যদিকে চলে' যায়।

আর সবার শেষে আসে একটি শান্ত ভদ্র কুকুর। অনেক দেরিতে এসে একপাশে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটিয়ে যায়।

—ধর্ম্মরাজ, তোমার ভাত নিয়ে রাত অবধি কে ব'সে থাকবে বল ত? আমার বাপু সন্ধ্যে হলেই ঘুম পায়।

উঠোনের একপাশে কতকগুলি ভাত দিয়ে কুকুরটার গায়ে একটি ঠোনা মেরে স্নেহের মৃদু হাসি হেসে মন্দা চলে' যায়।

বাপের সংসারে সব কাজই করতে হয়। মাও নেই, একটি বোনও নেই। দাদা আছেন। গরীবের ঘর, তাই বছরে এক-আধটি দিন ছাড়া কোনো দিনের কোনো বৈচিত্র্যই দেখা যায় না। একান্ত একঘেয়ে পুরাতন জীবনের বোঝা টেনে চল্‌তে চল্‌তে ছোট গৃহস্থটির যেন অকাল বার্দ্ধক্য ঘনিয়ে এসেছে। বাপ থেকেও

নেই; একেবারে নিস্পৃহ ব্যক্তি। তামাক খাবার নাম ক'রে বেরিয়ে যান, আবার তামাক কিনে বাড়ীতে ঢুকে কোণের ঘরটিতে তাঁর দিন কাটে। বোবা বৃহৎ পৃথিবী তাঁর দরজায় নিঃশব্দে হানা দিয়ে থাকে। দাদার দুবেলা মাষ্টারী—সময় বড় অল্প; পড়াশোনাও আছে। তাঁর আবার একটু চোখের দোষ ছিল। কাছের চেয়ে দূরের বস্তু তিনি যেন ভালই দেখতে পান্।

—আঃ দাদা যেন কি! কালো কাপড় আর ফর্সা জামা —রাস্তার লোকে হাসবে যে! দাঁড়াও, আমি কাপড় বা'র ক'রে দিই।

দাদার তখন আর তর সয় না,—ঠিক বলেচিস রে, সত্যি কথা —আমি.ত এতক্ষণ বুঝতেই পারি নি। এসব দিকে নজর তোদের ভারি ধারালো। দে' তবে, দে' ভাই একটু তাড়াতাড়ি। কই, কোথা গেলি? কাপড় একখানা আন্‌তে এত দেরি হচ্ছে? তুই কোনো কাজের নয়, মুখপুড়ি। আর একটু হলেই লোকে বোকা বলতো আর কি! মন্দা, কই রে?

মন্দাকিনী কাপড় এনে দেয়। কাপড় বদল ক'রে দাদা বলেন —সময় কম, সময় বড় অল্প!

দাদাকে মন্দা একটু-আধটু তিরস্কার করতে ছাড়ে না।— পৈতেপোড়া বেম্মচারির মতন তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্ছে

শুনি ? তোমার ধমক্ খাবার বয়েস এখনও পার হয় নি, এ কথা মনে রেখো দাদা।

দাদা বলেন—তাহলে একটু বসি, ধমকটা কি ধরণের শুনে যাই—কি বলিস্ ? কাজকম্ম কোথাও কিছু নেই, শুধু বেড়াতে বেরোচ্ছিলাম।

মন্দা হেসে তখন একেবারে লুটোপুটি,—তবে যে দৌড়চ্ছিলে দাদা ? তবে যে সময় কম বলে' আমায় ছুটোছুটি করালে ? বেশ তুমি লোক যা হোক।

—ওই ত আমার দোষ! কাজের চেয়ে কাজের ইচ্ছেটা আমায় ছোটায়।

মন্দা কাছে সরে' এসে দাদার হাতটি ধরে' বলে—আচ্ছা দাদা ?

—ওকি, কথা বলবার আগেই যে অম্নি চোখ ছল্ ছল্ ক'রে এল! কি শুনি ?

—তুমি বে'থা বুঝি করবে না ? আমি আর একলা থাক্তে পাচ্ছি না কিন্তু।

বিয়ে! তাইত—ওই যা, আজ আবার সভায় যেতে হবে; 'সারদা বিল' পাশ হচ্ছে—চোদ্দ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে হতে দেবো না!—দে ভাই, পান দে মন্দা।

পান হাতে নিয়ে মুখে দেবার আগেই তিনি ছুট্‌তে থাকেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন—এ হে

হে, পান থেকে চুণ খসে’ গেল। নাঃ, মন্দাটা কোনো কাজের নয়!

রাস্তায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে পানটি মুখে দেবার সময় আর তিনি পান্‌ না। সময় বড় অল্প!

মন্দাকিনী দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার ওই দ্রুত গতিটির দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

এম্‌নি করেই দিন চলে।—

সেই যে বলে’ গিয়েছিল ‘দেখা বোধ হয় আর হবে না’—তার স্মৃতি মনের কোন্‌ গভীর অতলে ডুবে গেছে। ডুবেছে একটু একটু করে’। ডুবে মরতে কি কেউ চায়? বাঁচবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে মনটা তোলপাড় করেছে, নিদ্রাহীন কোনো কোনো রাত্রে ক্ষণে-ক্ষণে ক্লিষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক’রে উঠেছে, একাদশীর রৌদ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধ দুপুরে মাঝে মাঝে ছোট্ট এক-একটি নিশ্বাস ফেলে গেছে। পুরাতন স্মৃতি মানুষকে বিপন্ন করে।

মন্দা দিব্যি করে’ বলতে পারে, তার কথা এখন আর মনেই পড়ে না।

আবার একদিন এক ঘর ভাড়াটে এল বটে।

খানিকক্ষণ সোরগোল চল্‌লো, জিনিসপত্র গোছাবার সাড়াশব্দ হতে লাগলো, দু’ একটি নর-নারীর অশান্ত কণ্ঠ শোনা গেল,

একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ কানে এল। তারপর ক্রমে ক্রমে আবার নিত্য-নিয়মত জীবন-যাত্রা সুরু হয়ে গেল। একটি স্বচ্ছন্দ সুশৃঙ্খল গৃহস্থালী সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এক সুরে বাঁধা থাকে।

কোনো-কিছুর সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা না-কি বিধবার রীতি-বিরোধী। মন্দার তাই কোনো কৌতূহল নেই। সে বরং আত্মগোপন করে' তুনিয়া থেকে মুছে যাবে, কিন্তু অযৌক্তিক আত্মপ্রকাশ করে' মিথ্যা প্রাধান্য নেবার মত তুর্ব্বলতা তার ছিল ছিল না। নিরুদ্বেগ আত্মস্থ মনটুকু আপনার মধ্যেই বিস্তার করে' সংসারের কাজ যেন তার সারাদিনে ফুরোতেই চায় না· সে যেন এই সংসারের লুকায়িত আত্মা—বাসুকীর মত অলক্ষ্যে ভার বহন করেই আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

বৌটির কিন্তু বয়স বেশী নয়।

ঢুলঢুলে তুটি চোখ, এলো-অগোছালো মাথার খোঁপা, শাদা শাদা দাঁত, মাথায় এয়োতির চিহ্ন—ইস্, একেবারে যেন আগুনের মত জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে! মাগো, এত সিঁদুর মানুষে মাথায় নেয়? কিন্তু পা তুখানিতে আল্তা পরে' সে যখন এসে দাঁড়ায় —আহা, যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটি!

নিবিড় আনন্দের উচ্ছ্বাসে মন্দার তুটি দীর্ঘায়ত কালো চোখ এক মুহূর্ত্তেই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আহা!

পরিচয় সহজে হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক যোগসূত্র যেখানে এক হয়ে মেলে, সেখানে কেমন একটি অভাব চোখে পড়ে। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে বৌটি একটু গম্ভীর হয়ে যায়—বিধবা মেয়ের মুখ ঘন ঘন দেখাটা তার যেন ঠিক কাম্য নয়। মাথার সিঁদুরের ওপর ঘোমটা টেনে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, হাতে সোনার চুড়িগুলি ও নোয়াটি লুকোয়। শুধু তাই নয়; হঠাৎ একদিন অসময়ে মন্দার সঙ্গে চোখচোখি হতেই সে চোখের একটি পালক ছিঁড়ে ফেলেছিল। কোলের ছেলেটিকে সে একটু সাবধানেই রাখে; বিশেষ করে' ছেলেকে খাওয়াবার সময় সে দরজাটা বন্ধই করে' দেয়। কেন দেবে না? ছেলের যদি নজর লাগে ত মন্ত্রপড়া জল আনতে আবার ছুটবে কে?

অনেক বিবেচনা, অনেক অবহেলা এবং অনেক দিনের পর একদিন সামান্য একটুখানি আলাপ হ'ল বটে। কাছাকাছি এসে অথচ ইচ্ছাকৃত খানিকটা ফাঁক রেখে কপাল এবং কালো দুটি ভুরু যথাসম্ভব কুঞ্চন করে' বৌটি বল্‌ল—বয়স ত বেশি নয় দেখছি, কপাল পুড়লো কদ্দিন?

কথার মধ্যে তার যেন চাবুক। প্রথমে গলার ভিতর মন্দার কথা প্রায় আটকে গেল। সে অনেক আশা করেছিল গোপনে এই সমবয়সী বৌটির সঙ্গে 'সখি' পাতাবে! ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করে' মুখে মৃদু কণ্ঠে বলল—এই দু'বছর!

বৌটি বল্‌ল—এত শান্ত কেন? অন্য কেউ হলে' বল্‌তো 'চুপো ডা'ন্‌'।—ঘর করেছিলে?

হঠাৎ এক ঝলক রক্ত মন্দার মুখে-চোখে ছড়িয়ে গেল। ছি ছি—এ কি লজ্জাকর শ্রীহীন প্রশ্ন। হেঁটমাথা তার আরও হেঁট হয়ে গেল।

—যাই হোক, সে বুঝতেই পাচ্ছি। একাদশী কর? সে ত করতেই হবে—বামুনের ঘর। পেড়ে কাপড় পরেছ কেন, লোকে যে নিন্দে করবে!—রাঁধে কে?

ঘাড় নেড়ে মন্দা জানালো, সেই রাঁধে।

—তা ত হবেই, একটা কিছু কাজ চাই ত! তা ছাড়া বিধবা মেয়ে গলায় পড়লে ঝি-রাঁধুনী লোকে ছাড়িয়ে দেয়, সেজন্যে কাউকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু অত ক'রে ছোঁয়া-ন্যাপাটা ভাল নয়; সবারই অমঙ্গল। গেরস্থর অকল্যেণ করা কি ভাল?

প্রথম আলাপেই এমনি একটা উচ্চ-নীচ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সহজ বন্ধুত্বের মাঝখানে যদি ছোট-বড়র প্রশ্ন আসে ত তার চেয়ে করুণ আর কিছুই নেই। মনের কথাগুলি প্রকাশ করবার পথ থাকে না, করতে গেলেই কেমন একটি ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হয়। দেখা হয়ে গেলে মন্দা তাই মনে মনে ভয় পেয়ে লুকোবার চেষ্টা করে, আর নয় ত কোনো কথাই খুঁজে পায় না।

একটি অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা বৌটিকে সদা-সর্ব্বদা যেন আচ্ছন্ন

করে’ থাকে। নিতান্তই সাধারণ মনোভাবের মেয়ে। সে কারো ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কারো সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন সে এতটুকু মনে করে না।

—অনেক পাপ না করলে বছরে আর পঁচিশটে একাদশী করতে হয় না। বিধবার মরণ ত আর নেই; আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে সেই একশো বছর অবধি টান্‌বে। ছি!

কিন্তু এই প্রচণ্ড অবজ্ঞাও মন্দার মনে রেখাপাত করে না, এ যেন তার সয়ে গেছে। এ ত ঠিক কথাই! এত বড় একটা অভিশাপ নিয়ে যদি বাঁচ্‌তেই হয়, তবে অন্যের প্রীতি পাবে সে কোন্ অধিকারে? সপ্রশংস দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চেয়ে মন্দা ভাবে, অপরের তুলনায় নিজে সে কত ছোট। ভাবে, বৌটির কতকগুলি দুর্ব্বলতার তলায় একটি বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা আত্মগোপন করে’ রয়েছে।

স্বামী স্ত্রীর ঘরকন্নার মধ্যে একটি চমৎকার ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য মন্দার চোখে পড়ে। টুক্‌রো-টাক্‌রা এক-আধটি কথা, একটুখানি হাসির আওয়াজ এদিকে যা ছিটকে আসে—তাই নিয়ে মন্দা মালা গাঁথে। বৌটির বয়স অল্প, অতএব প্রণয়-নিবেদনের ইঙ্গিত-আভাস এখনো চলে। একটু জোরে কথা কইলেই এদিক-ওদিক সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু লজ্জাটি যেন মন্দারই বেশী।

ওদিকে ওরা দুজনে যদি হাসি-তামাসা করে ত এদিকে রান্নাঘরে বসে' মন্দার মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে ; কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে।

কিন্তু দেখা গেল বৌটি বোকা নয়। মাঝামাঝি কাঠের বেড়া দিয়ে এর আগেই দুদিক আড়াল করা ছিল, হঠাৎ সেদিন নজরে পড়লো—বেড়ার সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করে' দেবার জন্য কাপড়ের কুটি গুঁজে দেওয়া হয়েছে। মন্দার সকল দৃষ্টিকে এড়াবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ নিদারুণভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। একটি কঠিন এবং সুতীব্র অসন্তোষ বার বার তাকে যেন বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছে।

—ধানের ভাত খাই, সবই বুঝতে পারি গো। ঘরের মেয়ে যে গোয়েন্দা হয় তা বাপু জানতাম না। লুকিয়ে লুকিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে' চেয়ে দেখা—কেমন? বয়েস কালের বিধবা, আরো কত গুণ বেরোবে তা কে জানে! ভালয় ভালয় এখন আমাদের দিন-ক্ষণ গেলে হয়।

করুণ একটুখানি ম্লান হাসি মন্দার মুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু এ ত' তার বৈধব্যের প্রতি শাস্তি নয়—এ যে ঘৃণা! তা হোক—

*

* *

সখির ছোট্ট ছেলেটি সবে হামাগুঁড়ি দিতে শিখেছে। কচি কচি আঙুল চুষে সে নিজের মনেই খেলা করে। ওধারে বসে'

বেড়ার ওপর হাত চাপড়ে বোধ করি সময় সময় বাধাকে অতিক্রম করতে চায়। মন্দার মনটা তৎক্ষণাৎ একেবারে উত্তাপ হ'য়ে ওঠে। ছেলের এই দুষ্টুমির শব্দ শুনে রান্নাঘরে বসে' হাসতে হাসতে তার পেটে খিল্ ধরে' যায়। ভাবে—কি বোকা! হোক না ছোট ছেলে, কিন্তু পুরুষ মানুষ এত বোকা হয়? ওধার থেকে একবারটি হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘুরে এলেই ত তাকে দেখে যেতে পারে! মন্দার ইচ্ছা করে' শিশুটির কানে কানে গিয়ে বলে' আসে—তুমি আর একটু বড় হলে' তোমার মাকে লুকিয়ে আমরা লুকোচুরি খেল্‌বো!—মন্দার উন্মুখ এবং ব্যাকুল মন পাগলের মত কেবলই ভাবে, ছেলেটির যত কিছু দৌরাত্ম্য তার কাছে আসবার জন্যেই!

সন্তানহীনা নারীর এ কোনো সাধারণ বাৎসল্য নয়, শিশুটিকে কোলে নিয়ে আপনার অন্তরকে সুশীতল করবার এ কোন সুলভ উচ্ছ্বাস নয়,—মন্দা যেন ছেলেটির মধ্যে নিজের মনকে খুঁজে পায়। দুজনের মধ্যে কোথায় যেন একটি নিবিড় বন্ধুত্বের যোগাযোগ আছে। ছেলেটির আহারে, নিদ্রায়, কান্নায়, হাসিতে, খেলায়, দুষ্টামীর মধ্যে মন্দা নিজেকে বেশ অনুভব করতে পারে। ছেলেটির হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি যেন মন্দারই অন্তরের আত্মপ্রকাশ!

কিন্তু তারপর একদিন যে ব্যাপারটি ঘট্‌লো তাতে

যেন সমস্তটাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত ও পদদলিত হয়ে গেল।

মেঝে থেকে প্রায় এক বিঘত্ উঁচু করে' কাঠের বেড়া বাঁধা সে দিন দুপুর বেলা চকিত দৃষ্টিতে মন্দা বেড়ার নীচে চেয়ে দেখলো, ছোট ছোট আঙুলগুলি মাটিতে চেপে ছেলেটি বসে' রয়েছে। এ লোভ আর মন্দা সাম্‌লাতে পারল না। বেড়ার এধারে বসে' হেঁট হয়ে হাতটি গলিয়ে সে ছেলেটির পায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে লাগলো। অবোধ শিশুটি খেলাচ্ছলে মন্দার দুটি আঙুল আঁকড়ে ধরে' মুখে পুরে দিল।

এই ত ঘটনা!

সখি হঠাৎ কোথা থেকে বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো। মন্দা তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে একেবারে রান্নাঘরে দে ছুট্। সে ভয়ানক হাঁপাচ্ছিল। একটি মস্ত বড় অপরাধ যেন অকস্মাৎ ধরা পড়ে গেছে।

বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। সখি এদিকে এসে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে' বল্‌ল—ছেলেকে আমার কি খাওয়াচ্ছিলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে?

ভয়ে ভয়ে মন্দা বেরিয়ে এসে কম্পিত কণ্ঠে বলল—কিছু ত খাওয়াই নি দিদি?

—দিদি বলে' আর সোয়াগ কাড়াতে হবে না। রাক্কুসি, কি

খাওয়াচ্ছিলি শিগ্‌গির বল্; নৈলে এখুনি পুলিশে খবর দেবো।

মন্দা ঠক্ ঠক্ করে’ কেঁপে উঠলো। এক মুহূর্ত্তে সজল চক্ষে বিকৃত কণ্ঠে বল্‌ল—আর কখনো এমন করবো না, এবার মাপ করুন।

—মাপ? দাঁড়া তোর ন্যাকামি আমি বার কচ্ছি হারামজাদি। সোয়ামির ঘর পুড়িয়ে খেয়েচিস্, ছেলের সখ কেন আবার? তা বলে’ আমার ছেলেকে হিংসে? আবাগি ছোটলোক!

সেদিন সমস্তক্ষণ ধ’রে নানারকম টোটকা ঔষধ খাইয়ে সখি তার ছেলের পেট থেকে বিষটুকু অবশ্য নামিয়ে দিয়েছিল। অতিরিক্ত মমতার অত্যাচারে রাত্রে ছেলেটার জ্বর এল।

পুলিশে খবর দিল না বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি মন্দাকে মাথা পেতে নিতে হল’। দিন তিনেক পরে দেখা গেল, সকাল বেলা গরুর গাড়ীর ওপর মালপত্র চালান্ যাচ্ছে। এ বাড়ীতে থাকা সখির পক্ষে বিপজ্জনক। বিষবৃক্ষের গোড়ায় কি কেউ বাসা বাঁধে?

না, কেউ বাঁধে না!

সুমুখে একটি জামগাছ উত্তপ্ত হাওয়ায় শুধু সির্ সির্ করতে লাগলো, একটি ঘুঘুপাখীর পাখার শব্দ দূর থেকে দূরে ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লো……

মন্দা সেইদিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে' রইল।

নববর্ষার আকাশ আবার মেঘে মেঘে আকুল হয়ে ওঠে। দিক্-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে' মানুষের নীড়গুলির মাথায় অন্ধকার নেমে আসে। কেতকী-কদম্বের বনে বনে দীর্ঘ তীব্র কেকারব শোনা যায়। চারদিক একাকার করে' অবিশ্রান্ত জলধারা নামে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা যায়, অশ্রুধৌত দিগন্তের মুখখানি ধীরে ধীরে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছে। রৌদ্রের হাসিতে তার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল!

*

* *

বর্ষার পরে শরতের প্রবেশ।

শহরের বাড়ী খালি পড়ে' থাকে না। আবার ভাড়াটে এল। একটি সুন্দরী মহিলা আর একটি সুন্দর কিশোর। মহিলাটি কোথাকার কোন্ জমিদার রাজার স্ত্রী। রাজার এক রক্ষিতার দুর্ব্যবহারে তিনি ছেলেটিকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেছেন। ওই একটিই সন্তান। রাজকোষ থেকে যৎসামান্য মাসহারা আসে। ছেলেটিকে যেমন করেই হোক মানুষ ক'রে তুলতে হবে।

টক্‌টকে রঙ, কালো কালো ঝাঁপা-ঝাঁপা চুল, ডালিমের দানার মত দাঁত,—দীর্ঘবিস্তৃত দুটি চোখ। কালোর চেয়ে নীলের আভা সে চোখে বেশি খেলে যায়। কণ্ঠস্বরের মধ্যে তার যেন একটি সঙ্গীত আছে! একবার শুনলে আর একবার শোনবার জন্য কান পেতে রাখতে হয়। চৌদ্দ বছরের ছেলের গায়ে হস্তীর মত শক্তি। নাম গোরা। গোরাই বটে! দুরন্ত দুর্ব্বার ছেলে কারো হাঁকডাক্ মানে না। সে যেন সত্যিই রূপকথার সেই রাজপুত্র; চোখে তার সেই তেপান্তরের আভাস, বুকে তার সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হবার দুর্জ্জয় সাহস।

দুদিন না যেতেই সমস্ত বাড়ীটা তার রুক্ষকণ্ঠের মুখরতায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌লো। এইটুকুর মধ্যে তাকে যেন ধরে না। উদার আকাশ আর দিগন্তজোড়া প্রান্তর ভিন্ন দেওয়াল-ঘেরা ছোট গণ্ডীর মধ্যে তাকে বাঁধা বড় কঠিন।

কিন্তু মন্দাকে আর সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনও খাটের তলায়, জান্‌লার পাশে, দরজার আড়ালে; কখনও রান্না-ঘরের নির্জ্জনতায়; কখনও বা ছাদের কোণে তাকে আবিষ্কার করতে হয়। গোরাকে তার ভয়ানক ভয় করে! গোরা যখন মাঝখানের কাঠের বেড়াটা এক-একবার হাত দিয়ে নেড়ে এর অস্তিত্বের অপ্রয়োজনের কথা জানিয়ে যায়, মন্দার বুকের ভিতরটা তখনই গুম্ গুম্ করে' ওঠে। গোরার গলার আওয়াজ শুন্‌লে

কিম্বা তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনায় শঙ্কাতুর হরিণীর মত সে ওই রকম কোনো গোপন স্থানে গিয়ে লুকোয়। গোরা যেন তার প্রাণ-দেবতার নিভৃত মণিকোঠার সংবাদ রাখে।

আত্মগোপন করে আর কতদিন চলে!

ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গোরা বলে' উঠলো—আরে বাঃ! দেখলে মা, দেখলে মজা? এদিকে আস্‌ছিল, আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল! শুনচ—আমি বাঘ না ভাল্লুক? বলি ওই, ও-বাড়ীর মেয়ে!

নিজের কথায় নিজেই সে উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

মা বললেন—লজ্জা কি! ভায়ের মতন,—তুই বাপু অত ক'রে চেঁচামেচি করিস নে। ছেলেমানুষ ভড়্‌কে যায়।

—মেয়েটা খুব শান্ত, না মা?

—শান্ত সবাই, তোমার মতন কেউ না!

রান্নাঘরে বসে' মন্দা সবই শুনছিল। একটি উন্মত্ত মন্থন তার ভিতরে তখন তোলপাড় করছে। মনে হচ্ছিল, উত্তেজনায় এখুনি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে!

কাজ যখন কিছু থাকে না, গোরা তখন শিস্‌ দিয়ে দিয়ে সমস্ত বাড়ীটায় পায়চারি করে' বেড়ায়। ঠুক্‌ঠাক্‌ দুম্‌দাম্‌ শব্দ ত তার জন্য লেগেই আছে। আকাশে উড়ন্ত পাখীর দিকে ঢিল্‌

ছোড়া তার একটি কাজ। সন্ধ্যার পর পড়ার সময় দেখা যায়, রাণী আর ধর্ম্মরাজ তার দুই পাশে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে' রয়েছে।

কল্‌তলায় জল আন্‌তে এসে আবার হঠাৎ সেদিন দুজনে দেখা।

—এবার? এবার কি হয়? পালাচ্ছিলে যে? এলেই তোমাকে ভয় খাইয়ে দেবো তাই লুকিয়ে বসেছিলাম! তুমি বুঝি ভেবেছিলে আমি বাড়ীতে নেই?

ঠক্‌ঠক্ করে' কেঁপে মন্দার হাত থেকে বাল্‌তিটা পড়ে' গেল। মা এসে সুমুখে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন—মন্দা, এসো মা তুমি আমার কাছে। হতভাগা অম্‌নি সবাইকে চম্‌কে দেয়।

গোরা বল্‌ল—মন্দা? মন্দা তোমার নাম? এ মেয়ে ত মন্দ নয় মা?

মা বলিলেন—চুপ কর্‌ তুই গাধা। মন্দা মানে মন্দাকিনী। স্বর্গের নদী!

মন্দা ইতিমধ্যে বাল্‌তিটা তুলে নিয়ে কোনমতে পাশ কাটিয়ে ওদিকে চলে' গেল। তার গতির দিকে চেয়ে হঠাৎ মা ও ছেলে দুজনের মুখেই কথা বন্ধ হয়ে রইল। মন্দাকিনী কি আঘাত পেয়েছে?

আঘাত সে কোথায় পে'ল কেউ জান্‌লো 'না! আঘাতকে

বিশ্লেষণ করে’ বোঝাবার শক্তি ত তার নেই! আড়ালে গিয়ে ভয়ব্যাকুল হয়ে মন্দা হঠাৎ ঝর ঝর করে’ কেঁদে ফেললো।

গোরা তখন ছাদে বসে’ আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল—স্বর্গের নদী! স্বর্গে কি নদী বয়? ওই আকাশে?

মা এধারে এলেন। মন্দা চোখ মুছে উঠে এসে তাঁর কোলের কাছে দাঁড়ালো। মা বললেন—এ কি, চুল যে ভিজে! জল বসে’ অসুখ করলে কেউ ত দেখবার নেই মা!

তাঁর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মন্দা মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—অসুখ করে না!

পাগ্‌লি কোথাকার!—ব’লে মা তার চুল ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—মুখটি যে শুকিয়ে গেছে মা! খাওয়া হয় নি এখনও?

ঘাড় নেড়ে মন্দা জানালো, না।

সে কি, বেলা যে গড়িয়ে গেল; চিলের ছাদে গিয়ে রোদ উঠেছে,—এত বেলায়—

চুপি চুপি মন্দা বল্‌ল—আজ খেতে নেই মা!

—ও। তাই বটে! আমার ত মনে থাকবার কথা নয়; কিছু মনে করিস্‌নে মা।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোরার পায়ের শব্দ হঠাৎ ওধারে শোনা যেতেই ব্যাকুল হয়ে মায়ের হাত ছাড়িয়ে মন্দা পালাবার চেষ্টা

করল—মা কিন্তু ছাড়লেন না। গোরা এধারে আসতেই তিনি সজল কণ্ঠে বলে' উঠলেন—যা তুই, যা এখান থেকে। এধারে আসিস্ নে—যা।

তাঁর কোলের মধ্যে মন্দার দেহখানি তখন থর থর করছে।

আচ্ছা, এর শোধ আমি নেবো, এই বলে' রাখ্‌লাম!—বলে' গোরা আবার দুপ্‌দাপ্‌ করে' চলে' গেল।

পরিচয় হয় না, আলাপ হয় না—কিন্তু ভয় মন্দার একটুখানি কমে গেছে। ইতিমধ্যে নিজের নামটি হয়েছে নিজেরই কাছে বিপজ্জনক। কারণ নেই, কৈফিয়ৎ নেই, প্রয়োজন নেই—যখন-তখন ওদিক থেকে গোরা তার নামটি ধরে' ডেকে ওঠে—সে তার কী কণ্ঠস্বর। নামের ওই দীর্ঘ আকারান্তটি ঘরে-বাইরে চারিদিকে ঘা খেয়ে খেয়ে মন্দার অন্তরের মধ্যে এসে ডুবে যায়। নিজের নাম অন্য কারো মুখ থেকে শোনার মধ্যে একটি লজ্জাও যেমন আছে, একটি অপরিসীম তৃপ্তিও তেমনি রয়েছে। মন্দা সাড়া দেয় না বটে, কিন্তু তার সমস্ত দেহ-মন নিজের নামটিকে নিয়ে বীণার তারের মত ঝঙ্কৃত হতে থাকে। মুখখানি তার দেখতে দেখতে টকটকে রাঙা হয়ে ওঠে। কণ্ঠও রোধ হয়ে আসে।

গোরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। চীৎকার ক'রে সে মন্দার নাম

ধরে’ ডাকবে, চীৎকার করে’ সে মন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে, চীৎকার করে’ সে মন্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে।

মা দাঁড়িয়েছিলেন। চট্‌ করে’ মুখ ফিরিয়ে গোরা বল্‌ল—ও কি পালাচ্ছ যে? একটু খাবার জল আমাকে দাও মন্দা।

মন্দা জল এনে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। গোরা বল্‌ল—হাতে দিলে জাত যায় বুঝি? দেখছ মা, দেখছ? এ রকম করলে আমি কিন্তু গিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি সব ভেঙে দিয়ে আস্‌ব তা বলে’ দিচ্ছি।

মা বললেন—ওই বীরত্বটুকু দেখানো বাকি আছে বটে।

কিন্তু গোরার আর সবুর সইল না। সেদিন সবাই বেরিয়ে যাবার পর মায়ের বারণ অগ্রাহ্য করে’ সে দু হাতের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে কাঠের বেড়াটা সরিয়ে দিল। মন্দা এই কাণ্ড দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। দরজা ঠেলে দিয়ে গোরা বল্‌ল—এবার নিরুপায়, কোথা যাবে যাও?

ওমা, এ ছেলে যে আগল ভেঙে ঘরে ছুটে আসে গো! মন্দা ভয়ে কাঠ হয়ে তার পায়ের দিকে চেয়ে রইল।

ঘরে ঢুকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে গোরা বল্‌ল—অনেক ভুগিয়েছ তুমি মন্দা, কদিন থেকে আমার ভারি রাগ হচ্ছিল। একটা লাঠিসোঁটা কিছু পেলে তোমাকে দু এক ঘা—

না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজেকে সে কোনো বিচিত্র স্থান থেকে আবিষ্কার করে' আনে। কথনো উঠানে, দালানে; কথনও ছাদের সিঁড়িতে কিম্বা কল্‌তলার ধারে; কথনও বা সদর দরজার পথে কিম্বা শোবার ঘরের একটি কোণে। এলো-মেলো ধূলো-বালিমাথা মাথার চুল, গায়ে ব্যথা, চোখে ক্লান্তি—কেমন একটি আনন্দহীন অবসন্নতা!

—কে রে? মন্দা? এসো মা এসো। এত রাতে মাকে বুঝিয়ে মনে পড়লো?

মন্দা গিয়ে মায়ের কাছে বসলো। মা বললেন—এই চিঠিখানা পড়ছিলাম মা, ওঁর কাছ থেকে এসেছে। পড়ে' ত অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন; শিগ্‌গিরই গোরাকে দেখতে আসবেন—এই সব! তুমি এত রাত অবধি জেগে রয়েছ?

মন্দা বল্‌ল—শুতে যাচ্ছিলাম তাই একবার—

মা বললেন—পাগলি, এদিক-ওদিক চাইছিস যে? ভয় নেই রে ভয় নেই, সে ও-ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় কি তুই সঙ্গে এনেচিস মুখপুড়ি?

ভয় ত নয় মা!—বলে' মন্দা একটু হেসে তথনই আবার উঠে দাঁড়ালো। বল্‌ল—দাদাকে পান দিয়ে আসতে ভুলে গেছি।

মন্দা চলে' যাবার কিয়ৎক্ষণ পরে মায়ের চোখে বোধ করি

তন্দ্রা এসেছিল। অকস্মাৎ গোরার চীৎকার শুনে ঘুম-ভেঙে ধড়মড় করে' উঠে বসলেন। আলো ইতিমধ্যে নিবে গিয়েছিল। ছাদের পাঁচিল পার হয়ে কেবল এক ঝলক্ চাঁদের আলো এসে বারান্দায় পড়েছিল।

মা উঠে এসে গোরাকে ধরে' ফেলে বললেন—কি হয়েছে রে? স্বপ্ন দেখলি বুঝি?

ভয়ে আর বিস্ময়ে গোরার তখন কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল। এদিক-ওদিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বল্ল—স্বপ্ন নয় মা…… ঘুমোচ্ছিলাম……কে যেন—আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি মা… বিছানার ধারে এসে…আমি আর একলা শুতে পারবো না কিন্তু।

মা বললেন—একলা থাকার বড়াই করতিস যে—চল্ আমার কাছে। ডরিয়ে উঠেছিলি বুঝতে পাচ্ছি।

গোরা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্ল। মনে হ'ল রহস্যটি তার কাছে রহস্যই রয়ে' গেল! কিন্তু মন তার হাল্কা; হঠাৎ ঘুম-চোখে মায়ের হাত ধরে' একটু হেসে বল্ল—মন্দা জেগে থাকলে আমার মজা দেখে হাসতো, না মা? আমার কিন্তু সত্যি ভয় লেগে গেছল!

মা বললেন—সেদিনও বল্লি, ঘুমের ঘোরে কে যেন তোর পায়ে হাত দিয়ে…দূর হোক গে ছাই, আজ থেকে আর আমার

কাছ ছাড়া হোস্ নে। অনেক লোকের আনাগোনা এ বাড়ীতে হয়ে গেছে কি না, তাই জন্মে—

অন্ধকারে চোরের মত মন্দা আলুথালু হয়ে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। সর্ব্বাঙ্গ তার থর থর করছিল!

*

*　　*

তারপর একদিন রাজা এলেন। গাড়ী-ঘোড়া এল, লোকজনের হাঁক-ডাক পড়ে' গেল। উৎসবে, আয়োজনে, আনন্দে ওদিকটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কান্নার পর হাসি, দুঃখের পর সুখ, রাত্রির পর দিন।

ছেলে ও মায়ের নাগাল আর সহজে পাওয়া গেল না। আজ তাঁরা রাজ-পরিবারের অন্তর্গত। সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রার সঙ্গে আজ আর তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। প্রীতির চেয়ে আজ শ্রদ্ধা বেশি, ভয়ের চেয়ে ভক্তি—বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মসম্মান!

রাজার আগমনে আজ সবার ছোটখাটো সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে' গেছে।

বাঁধা-ছাঁদা এর আগে থেকেই চলছিল—রাণী-মা বিলি-ব্যবস্থা করছিলেন। গোরা তখন একবার এধারে এল। পিছন

থেকে গলা বাড়িয়ে বল্‌ল—ওকি, ছুঁচে সুতো পরানো নেই, কাপড় সেলাই হচ্ছে কি করে' ?

ছি, ছি, তাই ত—এ কি ভুল! মন্দা সেটা তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌ল। গোরা বল্‌ল—বাবা, আমাদের নিতে এসেছেন, আমরা চল্‌লাম মন্দা।

কাঙালিনী মুখ তুলে রাজপুত্রের দিকে তাকালো। দেখ্‌লো, রাজপুত্রের মাথায় মখমলের টুপি, গায়ে জরির কাজ-করা জামা, পরনে রেশমি ধুতি—সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের আভাস। প্রবল একটি আঘাতকে গোপন করে' আজ এই প্রথম নিতান্ত লজ্জাহীনার মত হঠাৎ মন্দা বল্‌ল—চলে' যাবে? এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে?

তার সেই অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট, করুণ দুটি বিশাল চক্ষুর দিকে চেয়ে রাজপুত্রের এতদিনের সমস্ত চঞ্চলতা থেমে গেল। মাথা হেঁট করে' শান্তকণ্ঠে শুধু বল্‌ল—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি; আবার এ বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে আসবে—কি বল?

মন্দার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোল না। কিই-বা বলবে! রাজ-পরিবারের সঙ্গে এক-আধদিনের জন্য ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এইটুকুই তার জীবনে যথেষ্ট নয় কি? পথবাসিনীর ইতিহাসে এইটুকুই ত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত!

বিদায়-বেলার ভাষা আর কিছু খুঁজে না পেয়ে রাজপুত্র চলে' গেল, দূর পথের দিকে তাকিয়ে কাঙালিনীর দৃষ্টি কাঁপতে লাগলো।

*

*   *

চিরজীবনের একটি অশান্তি দিয়ে গেছে! চিরকালের কাঁটা!

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উৎসাহ এবং প্রাণধারণের স্পৃহা যে-শিকড় থেকে আপনার রসসঞ্চয় করে তা হচ্ছে নারী-জীবনের একটি বড় ব্যর্থতার সুর। সে সুমহান ব্যর্থতার মধ্যে ছোটখাটো স্মৃতি, বিক্ষোভ, গ্লানি, পাওয়া-না-পাওয়া, কোনোটাই ঠাঁই পায় না!

শুধু কেবল অশোক আর শিমূলের বনে বনে যখন আগুন লাগে, রজনীগন্ধার সকরুণ ইঙ্গিত যখন চন্দ্রালোকের দিকে ঊর্দ্ধায়িত হয়ে ওঠে, বনমর্ম্মর যখন ছায়াপথে সঙ্গীত রচনা করে—আর দিশাহারা দক্ষিণের হাওয়া যখন ঘরের ভিতর সকল কোণ বিশৃঙ্খল করে' যায়—

মধ্যরাত্রে পক্ষিরাজের আগমন-সংবাদে চকিতা ও ত্রস্তা রাজকন্যার ঘুম ভাঙে!

মন্দা ধড়মড় করে' জেগে ওঠে। নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপটিকে একটুখানি উজ্জ্বল করে' দেয়। আর ঘুমোলে যেন তার চলবে না—কেউ যদি এসে ফিরে যায় ?

তাড়াতাড়ি উঠে সে বাইরে আসে। পাশের ঘরে ঢুকে দাদার গা ঠেলে বলে—ওঠো দাদা, ওঠো শিগ্‌গির একবার। ওঠো—

দাদা ঘুম ভেঙে হকচকিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসেন—কেন রে মন্দা ? চোর এসেছে ?

দেখে এসো দিকি, একটু আগে কে যেন কড়া নাড়লো, ঘুমের ঘোরে সাড়া দিতে পারি নি ! দেখে এসো ত দাদা !

দাদা চোখ রগ্‌ড়ে কি যেন একটা আপত্তি করতে যান্।

না দাদা, না, সত্যি বল্‌ছি, আমি যে শুনলাম ! আমার নাম ধরে' ডেকে ডেকে—ঠিক যেন সেই চেনা গলা—আমি ঘুমোই নি দাদা, জেগেই ছিলাম !—ওই শোনো, আবার শব্দ হচ্ছে !—উত্তপ্ত দুই ফোঁটা অশ্রু ততক্ষণে তার চোখের কোলে নেমে এসেছে।

দাদা সেই দিকে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে বলেন—ও যে হাওয়া রে, ও যে বাতাস……

উত্তেজিত মুখ আর চঞ্চল চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

মন্দা বলে—বাতাস! কিছুতেই না—এত জায়গা থাকতে হাওয়া-বাতাস কি শুধু এই বাড়ীতেই দাদা?

—এটা যে ফাঁকা বাড়ী রে! ওদিকটা যে হু হু করছে!

একটি বেদনাক্লিষ্ট অশ্রুভারাতুর গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে' মন্দা শুধু বল্‌ল—ও—তাই বটে! ফাঁকা বাড়ী কিনা, তাইজন্যে হু হু করে'—

আরও কি যেন বলতে গিয়ে তার মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল!

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা